প্রাপ্তিস্থান—কাত্যায়নী বুক ষ্টল
২০৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ: ১৩৬৭

অনুবাদক—শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য
প্রকাশক—শ্রীগিরীন্দ্র চন্দ্র সোম ২০৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা
প্রিন্টার—শ্রীননীগোপাল সিংহ রায় 'তারা প্রেস' ১৪বি, শঙ্কর ঘোষ লেন

পরিচয়

ইভান বুনিন রাশিয়ার ভোরোনেজ শহরে জন্মগ্রহণ করেন ১৮৭০ সালে। ইনি ছিলেন বনেদি ঘরের ছেলে, এঁর বাপ ছিলেন সেকালের রাশিয়ার বড় জমিদার। ঋষি টলষ্টয় ও তুর্গেনেভের সাহিত্যিক আবহাওয়ার মধ্যে থেকে বুনিন খুব অল্প বয়স থেকেই সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। প্রথমে বড় বড় ইংরেজ কবিদের তর্জমা করতে আরম্ভ ক'রে অতি শীঘ্রই ইনি গদ্য ও পদ্য রচনায় অদ্ভুত প্রতিভার পরিচয় দেন, এবং কবিতা লেখার জন্য রাশিয়ার সুবিখ্যাত পুশ্‌কিন-প্রাইজ লাভ করেন। কিন্তু জগতের লোকে তাঁর অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পেয়েছে অনেক পরে। এর কারণ তিনি নিজে সেজন্য কোনো চেষ্টা করেন নি এবং বিদ্বান্ সমাজের মধ্যেও কখনো মিশতে যাননি। এঁর নেশা ছিল কেবল একা একা দেশভ্রমন করা এবং লেখা, এই নিয়েই সর্বদা থাকতেন। ইউরোপ, আফ্রিকা, চীন, জাপান, ভারতবর্ষ, সকল দেশেই ইনি ঘুরে বেড়িয়েছেন। একবার যখন ইনি 'দি ভিলেজ' নামে একটি নভেল লিখলেন তখন জগতের সাহিত্যিক মহলে প্রথম সাড়া জাগলো, এঁর লেখার মধ্যে স্পষ্টবাদিতার একটা নতুন রকমের অসম-সাহসিক ভঙ্গী দেখে। ঐ নভেল লেখা হয়েছিল রাশিয়ান কৃষকদের নিয়ে, তাদের চরিত্রের ভালো এবং মন্দ দুটো দিকই ইনি অপূর্ব্ব বাস্তবতার মূর্তিতে ফুটিয়ে তুলেছিলেন কোনো রকমের কল্পনার রং না চড়িয়ে, তাই নিয়ে তখন সাহিত্যিক মহলে অনেক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। অনেকে এঁর নির্জলা স্পষ্টবাদিতার নিন্দাও করেন। একদিন মানুষের প্রতি মানুষের যে কোনো দরদ থাকবে না, এবং মানুষের আত্মম্ভরিতার মোহে পৃথিবীর দুঃখ দুর্দশা যে কতটা চরমে গিয়ে পৌঁছবে, এ-কথা ইনি জানতে পেরেছিলেন

গত মহাযুদ্ধের আগেই, এবং তখনকার দিনেই এ-কথার আভাষ দিয়েছিলেন "সানফ্রান্সিসকোর যাত্রী" এবং তার পরে "ভ্রাতৃকুল" নামে দুটি সুবিখ্যাত বড়-গল্পে। এই দুটির মধ্যে যে অপ্রিয় সত্য আছে তা অনেকে সহ্য করতে পারেনি। তখনকার সমালোচকরা বলতেন যে এঁর দৃষ্টিভঙ্গী বড় নিষ্করুণ, এর কথাগুলো বড় তিক্ত, ইনি যেমন বলেন মানুষের সম্বন্ধে এতটা হতাশ হবার কোনো কারণ নেই। কিন্তু এর পরেই মহাযুদ্ধ বেধে যায়, তারপরে দেখা যায় যে পৃথিবীর ভিতরকার প্রকৃত অবস্থাটা এঁর লেখার চেয়ে আরো বেশি তিক্ত এবং মারাত্মক।

যুদ্ধের সময় ইনি মানুষের প্রতি অত্যাচার দেখতে না পেরে মস্কো পরিত্যাগ ক'রে রাশিয়ার দক্ষিণ সীমান্তে পালিয়ে যান। সেখানে গিয়েও দেখলেন যে নির্মমতা এবং অত্যাচারের হাত থেকে কোথাও নিষ্কৃতি নেই। সেই বিপ্লবের যুগে রাশিয়ার লোকের দুর্দশা ইনি স্বচক্ষে দেখতে লাগলেন, কিন্তু যুদ্ধ শেষ হ'য়ে গেলেই ইনি স্বদেশ পরিত্যাগ ক'রে ফ্রান্সে গিয়ে বাস করতে লাগলেন। প্রতিজ্ঞা ক'রে গেলেন যে—অত্যাচার এবং অবিচার দূর না হ'লে নিজের দেশে আর ফিরবেন না, কিন্তু ভবিষ্যদ্বাণী ক'রে গেলেন যে একদিন নিশ্চয়ই সে সুদিন আসবে।

১৯৩৩ সালে ইনি সাহিত্যসৃষ্টির জন্য বিখ্যাত নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। বর্তমান যুগে উঁচুদরের সাহিত্য সৃষ্টির জন্য রাশিয়ার খ্যাতিই বোধ হয় সর্বাপেক্ষা অধিক, এবং প্রতিভাশালী লেখকের সেখানে অভাব নেই, তন্মধ্যে বুনিনই সর্বপ্রথমে নোবেল পুরস্কার পাবার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। এঁর পূর্বে কোনো রাশিয়ার লেখক এ পুরস্কার পাননি।

বুনিনের লেখাকে সময় কাটাবার উপযোগী নভেল কিংবা গল্প কিছুই বলা চলে না। এঁর লেখা পড়লেই মনে হয় ইনি উঁচুদরের একজন দ্রষ্টা, পাঠকের চিত্তবিনোদনের জন্যই ইনি লিখছেন না, জীবনের সম্ভোগকেই ইনি বড়ো ক'রে দেখছেন না, মানুষের অন্তরের মধ্যে যে অনির্বচনীয় সুষুপ্ত অবস্থায় বাস করে তাকেই সাড়া দিয়ে জাগিয়ে তোলবার জন্যে এঁর চেষ্টা। সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বে এঁর বিশ্বাস আছে, বুদ্ধ যীশুখৃষ্ট প্রভৃতি মহাপুরুষদের মহত্বে এঁর আস্থা আছে।

বুনিনের কাছে সকলেই হ'তে পারে গল্পের নায়ক, তার কোনো বাচবিচার নেই। ইনি বলেন, পৃথিবীতে যেখানে যে-কেউ জন্মেছে তার মধ্যেই জমা হ'য়ে আছে গল্পের উপকরণ, কেবল বলতে পারলেই তা চমৎকার শোনাবে। এঁর লেখার মধ্যে তাই কোটিপতি থেকে শুরু ক'রে সামান্য সৈনিক, রিক্শওয়ালা, এমন কি কুকুর পর্যন্ত হয়েছে গল্পের নায়ক। যেমন জীবন এবং মৃত্যু নিয়ে প্রত্যেকটি প্রাণীর গল্প তৈরি, বুনিনের লেখাতেও ঠিক তাই হয়। বুনিনের অধিকাংশ গল্পেই মৃত্যু এসে দেখা দেয় অকস্মাৎ চরম ঘটনাস্বরূপ, তখন জীবনের সকল রকম চেষ্টা হ'য়ে যায় ব্যর্থ, ব্যঞ্জনা এবং আড়ম্বর হ'য়ে যায় তুচ্ছ, আয়োজন হ'য়ে যায় নিরর্থক, সম্পদ হ'য়ে যায় শক্তিহীন, এবং সেইখানেই বুনিনের বক্তব্যেরও হয় চরম পরিণতি।

এঁর গল্প কেবল চোখ বুলিয়ে পড়ে যাবার জিনিস নয়, প্রত্যেকটি কথার অর্থ বুঝে ধীরে ধীরে পড়তে হবে, কারণ প্রত্যেকটি কথার একটা সার্থকতা আছে। এঁর লেখার মধ্যে বাস্তবাতীত এমন একটা উদাসীনতার আবহাওয়া আছে যে পড়তে পড়তে বারে বারেই সন্দেহ জাগে,—এ বাস্তবসর্বস্ব কোনো ইউরোপীয়ের লেখা পড়ছি, না পরার্থ-সন্ধানী কোনো ভারতীয় মনীষীর লেখা পড়ছি।

বুনিনের কয়েকটি বাছাই-করা লেখা এখানে বাংলাভাষায় তর্জমা করা হয়েছে। এর মধ্যে তাঁর মূল বাক্যবিন্যাসের ধারা এবং বাচনভঙ্গী যথাসম্ভব অবিকৃত রাখবার চেষ্টা করা হয়েছে। অবশ্য এ কথা স্বীকার্য যে এক ভাষার জিনিস অন্য ভাষায় রূপান্তরিত করতে গেলেই তার মাধুর্য নষ্ট হ'য়ে যাওয়া সম্ভব। প্রত্যেক দেশের রচনাই তার নিজস্ব ভাষা বিষয়বস্তু এবং লিখনভঙ্গী মিলিয়ে একটা বিশিষ্ট রূপ নেয়, অন্য দেশের ভাষার মধ্যে তাকে চালিয়ে নিতে গেলেই তার অল্পবিস্তর বিকৃতি ঘটে। কিন্তু তবু বাঙালী পাঠককে বুনিনের লেখা পড়বার আনন্দ দিতে গেলে তাকে বাংলাভাষায় তর্জমাই করতে হয়। এই তর্জমা যদি কতকাংশেও সার্থক হ'য়ে থাকে তাহ'লে এর মধ্যেই পাঠক বুনিনের বিশেষত্বের পরিচয় পাবেন। বুনিনের লেখার যে অভিনব ধারা, তাঁর বর্ণনা-বাহুল্যের মধ্যে যে বিচিত্র একরকম আবহাওয়া জেগে ওঠে, রূপকচ্ছলে সামান্য কথা বলতে বলতে তার অন্তরালে যে অসামান্যের আভাস ফুটে বেরিয়ে পড়ে, তাঁর আপাত-নির্লিপ্ততার অন্তরালে যে একটা অন্তর্নিগূঢ় মমতার ইঙ্গিত পাওয়া যায়,—বাংলাভাষায় যদি তার কিঞ্চিৎমাত্রও পরিচয় দেওয়া সম্ভব হয়ে থাকে তাতেও অনেক লাভ আছে।

অনুবাদক

সানফ্রানসিস্‌কোর যাত্রী

দীর্ঘকালের জন্য অবসর নিয়ে সানফ্রানসিস্‌কোর সেই ভদ্রলোকটি (এস্থলে অজ্ঞাতনামা) তাঁর স্ত্রী আর কন্যার সঙ্গে ইউরোপ পরিভ্রমণ করতে বেরিয়েছিলেন।

দূর সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে দেশ ভ্রমণের বিলাস করবার জন্যে যে অর্থের দরকার সে তাঁর যথেষ্ট ছিল। নিজের চেষ্টায় তিনি ধনী হয়েছেন, আটান্ন বছর বয়স পর্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রমের পর এই সবেমাত্র জীবনে আরাম উপভোগ করতে শুরু করছেন। এতকাল তিনি জীবিত থেকেও যেন জীবন্ত অবস্থায় ছিলেন না; দিনের পর দিন শুধু খেটেই গেছেন, উপভোগের যা কিছু সব ভবিষ্যতের জন্যই তোলা ছিল। তাঁর কারখানায় হাজার হাজার কুলিমজুর, তারা সকলেই জানে কী অমানুষিক অধ্যবসায়ের সঙ্গে তিনি কাজ করে এসেছেন। যে উদ্দেশ্য নিয়ে কাজে লেগেছিলেন তা এতদিনে সার্থক হ'য়ে এসেছে, উন্নতির চরম সীমায় পৌঁছে এইবার একটু হাঁপ ছেড়ে বিশ্রাম নেবার পালা। আমেরিকার ধনী ব্যক্তিরা সকলেই সমুদ্র পার

হ'য়ে ইউরোপ ঈজিপ্ট ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশ পর্যটন করতে বেরোয়, অতএব তিনিও এবার তাই করবেন মনস্থ করলেন। ভেবে দেখলেন, যে এতদিনের খাটুনির পর এই তাঁর ন্যায্য পুরস্কার, আর স্ত্রী-কন্যাকেও এর আনন্দ থেকে বঞ্চিত করা উচিত নয়। স্ত্রীর এখন যে বয়স, আমেরিকার মেয়েরা এই বয়সেই বিদেশ বেড়াতে ভালবাসে। কন্যাটিও নেহাৎ ছোট নয়, তার শরীরটাও ভাল যাচ্ছে না, বিদেশে বেড়াতে নিয়ে গেলে তার স্বাস্থ্যটা ভালই হবে। আর স্বাস্থ্য ছাড়াও দেশ-বিদেশে ঘুরতে ঘুরতে কত লোকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হবে, হয়তো বা কোন ক্রোরপতির সঙ্গে এক টেবিলে খাওয়া, হয়তো বা কারো সঙ্গে হঠাৎ ঘনিষ্ঠতা হ'য়ে যাওয়া, এমনি কতরকম ভাবে ওর ভবিষ্যতের একটা ব্যবস্থা হ'য়ে যেতে পারে।

ভদ্রলোক এক বিস্তারিত ভ্রমণতালিকা প্রস্তুত করে ফেললেন। প্রথমত ডিসেম্বর জানুয়ারিতে দক্ষিণ ইটালি গিয়ে সেখানকার রৌদ্রস্নান উপভোগ করবেন, সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন ইটালির কীর্তিস্তূপগুলো দেখবেন, বিখ্যাত ট্যারান্‌টেলা নাচ দেখবেন, পথে পথে যে সুধাকণ্ঠী গায়িকারা বীণা বাজিয়ে গান গেয়ে বেড়ায় তাদের সেই গান শুনবেন। আর সেখানে সব চেয়ে লোভনীয় যে সব নিয়াপোলিটান সুন্দরীদের কথা শোনা গেছে, তাও অবশ্য চোখেই অনেক দেখতে পাওয়া যাবে। বড়দিনের উৎসবের সময়টা কাটাতে হবে গ্রীসে ও

মণ্টিকার্লোতে, কারণ সভ্যসমাজের যত সেরা লোকেরা সে সময় ঐখানে গিয়ে জমায়েৎ হয়। যারা সভ্যজগতের শিরোমণি, যারা সমাজের আদর্শ ভাঙে গড়ে, পোষাকের ফ্যাশন বদলায়, যারা রাজার সিংহাসন পর্যন্ত টলাতে পারে, যুদ্ধবিগ্রহ ঘটাতে পারে, যাদের উপস্থিতিতে বড় বড় হোটেলের আভিজাত্য আরো অনেক বেড়ে যায়, তাদের সঙ্গে সেই সকল হোটেলে গিয়ে একত্রে বাস করতে হবে। তারা ওখানে গিয়ে জোটে কেবল আনন্দ করতে,—কেউ বা মোটর-রেসে ও নৌ-বিহারে মত্ত হয়, কেউ বা জুয়াখেলায় মত্ত হয়, কেউ বা কেবল সুন্দরীদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে বেড়ায়, আবার কেউ বা পাখী শিকার করে বেড়ায়; সবুজ মাঠ থেকে সাদা পায়রার ঝাঁক উড়ে যায় নীল আকাশের কোলে, ওদের বন্দুকের গুলিতে ঝপ্ ঝপ্ ক'রে সেগুলো মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।···মার্চ মাস নাগাদ যাওয়া যাবে ফ্লোরেন্সে, সেখান থেকে রোমে; তারপর হবে ভিনিস, প্যারিস,—সেভিলে গিয়ে সেখানকার বিখ্যাত ষাঁড়ের লড়াই দেখা, টেম্স নদীতে গিয়ে স্নান করা,—শেষে কনষ্টাণ্টিনোপল, ঈজিপ্ট, এমন কি জাপান পর্যন্ত, অবশ্য এগুলো ফেরার পথে।···

যাত্রা শুরু ক'রে প্রথমটা বেশ নির্বিঘ্নেই কাটলো। তখন নভেম্বর মাস শেষ হ'য়ে এসেছে। জিব্রল্টার পর্যন্ত সারা সমুদ্রপথ কুয়াশায় আচ্ছন্ন, মাঝে মাঝে ঝড়তুফান আর তুষারপাত

হচ্ছে। জাহাজ কিন্তু বেশি দোল খায়নি, নির্বিঘ্নে মন্থরগতিতে চলেছে। যাত্রীতে জাহাজ ভর্তি, তার মধ্যে অনেকেই নামজাদা লোক। খ্যাতনামা সেই "অ্যাটলাণ্টিস" জাহাজখানা সম্পূর্ণ আধুনিক আসবাবপত্রে সজ্জিত যেন পুরাদস্তুর একটা উঁচুদরের ইউরোপীয় হোটেল। প্রশস্ত তার পানাগার, টার্কিশ স্নানাগার, আবার জাহাজের ছাপানো নিজস্ব দৈনিক সংবাদপত্রও একটা আছে; দিনগুলো বেশ আড়ম্বরের সঙ্গেই কেটে যাচ্ছিল। বিউগ্‌লের ডাকে রোজ ভোরে যাত্রীদের ঘুম ভাঙে, সেই বিস্তীর্ণ শ্যামধূসর তরল মরুভূমির মধ্যে কুয়াশার ঘন আবরণ ভেদ ক'রে অতি ধীরে ধীরে দিনের আলো ফুটে ওঠে, ফ্লানেলের পায়জামা-পরা যাত্রীরা তখন আলস্য ত্যাগ ক'রে প্রথম পেয়ালা কাফি বা কোকো খেয়ে একে একে স্নানাগারে ঢোকে, দেহমর্দন ও কিছু ব্যায়াম ক'রে নিয়ে তারা চাঙ্গা হ'য়ে ওঠে, তারপর তাড়াতাড়ি প্রসাধন সেরে প্রাতরাশে গিয়ে বসে। এর পরে বেলা এগারোটা পর্যন্ত তারা খোলা ডেকের উপর আমোদ-আহ্লাদ ক'রে ঘুরে বেড়ায় আর সমুদ্রের তাজা কন্‌কনে বাতাসটি উপভোগ করে; অনেকে ডেক্-টেনিস খেলে খিদে বাড়িয়ে নেয়। এগারোটার খানা খেয়ে তারা আরাম-কেদারায় এক একখানা খবরের কাগজ নিয়ে বসে যায় একেবারে লাঞ্চের সময় পর্যন্ত। লাঞ্চ খাওয়ার পর দুঘন্টা বিশ্রাম। ডেকের উপর সারি সারি হেলানো ডেক্-চেয়ার পাতা, যাত্রীরা পশমী

আস্তরণ জড়িয়ে সেই চেয়ারে গা ঢেলে দিয়ে কুয়াশায় ঢাকা আকাশের দিকে চেয়ে থাকে, ঢেউয়ের মাথায় মাথায় সাদা ফেনার রাশি কত উজ্জ্বল হ'য়ে ফেনিয়ে উঠছে তাই অনেকে চেয়ে চেয়ে শুধু দেখতে থাকে,—অনেকে মধুর তন্দ্রাভরে বসে বসে কেবল ঝিমোতে থাকে। পাঁচটা পর্যন্ত এমনি কাটে, তারপর আবার চাঞ্চল্যের সাড়া লাগে, তখন ধূমায়িত সুগন্ধি চায়ের সঙ্গে আসে সুমিষ্ট কেক। সাতটার সময় আবার বিউগ্‌ল বাজে, ডিনার খাবার সঙ্কেতধ্বনি। অন্যান্য সকলের সঙ্গে সানফ্রানসিস্‌কোর সেই ভদ্রলোক তখন পরম উৎসাহে দুহাত ঘষতে ঘষতে কেবিনে চলে যান পোষাক বদলাতে।

সন্ধ্যার সময় "অ্যাটলাণ্টিস" দুই পাশে সহস্র সহস্র জ্বলন্ত চক্ষু নিয়ে অন্ধকারের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে অগ্রসর হ'তে থাকে, আর জাহাজের মধ্যে রন্ধনশালায় পানশালায় তৈজস-ভাণ্ডারে রসুয়ে চাকরবাকরদের মধ্যে ব্যস্ততার ধুম লেগে যায়।

ওদিকে সারাক্ষণ যে সমুদ্রে তোলপাড় চলেছে, কারো সেদিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র নেই ; ও সকল ভাবনা কাপ্তেনের, সুতরাং সকলে নিশ্চিন্ত। এই কাপ্তেন মহাপ্রভুটির গুরুভার বিরাট বপু, চুল কটা, চিত্ত নির্বিকার ; সোনার জরী বসানো অদ্ভুত পোষাকে মনে হয় যেন তিনি সাধারণের মতো মানুষই নন, একটি স্বতন্ত্র রকমের সাজগোজ পরানো সচল প্রতিমা, যাত্রীদের দর্শন দিতে ক্বচিৎ কখনো তাঁর রহস্যময় কেবিনগুহার ভিতর

থেকে বেরিয়ে আসেন।…ক্ষণে ক্ষণে জাহাজের বাঁশি তীব্রস্বরে বেজে বেজে ওঠে, কিন্তু ভোজনরত যাত্রীর দল তা যেন শুনতেই পায় না; তাদের ডিনার-ঘরে তখন শ্রুতিমধুর ব্যাণ্ডের ঐক্যতান সঙ্গীত অনবরত বেজে চলেছে, বাঁশির সঙ্কেতধ্বনি তাতে চাপা পড়ে গেছে। মার্বল কাগজ মোড়া প্রশস্ত সেই দোতলা হলঘরে আগাগোড়া মখমলের গালিচা পাতা, বেলোয়ারি ঝাড় ও স্ফটিক-গোলকের উজ্জ্বল আলোয় চতুর্দিক মুখরিত। সেখানে মণিমুক্তার অলঙ্কারে শোভমানা নগ্নগ্রীব সুন্দরীদের ভিড়, পুরুষেরাও সকলে ডিনারের পোষাকে নিখুঁতভাবে সজ্জিত। পরিবেশনকারীর দল রকমারি জমকালো পোষাকে ব্যস্তভাবে ঘোরাঘোরি করছে, তার মধ্যে বিশিষ্ট একজন যে কেবল পানীয় জোগায় তার গলায় ঝুলছে লর্ড মেয়রের মতো একছড়া মোটা চেন। সানফ্রানসিস্‌কোর সেই ভদ্রলোকটিও সেখানে উপস্থিত। নতুন ডিনার-কোট ও নিভাঁজ পায়জামাতে তাঁকে বেশ অল্পবয়স্ক দেখাচ্ছে। বেঁটে চেহারা কিন্তু বলিষ্ঠ গঠন, পোষাকে চাকচিক্য আর চোখে-মুখে স্ফূর্তি নিয়ে তিনি এই ঔজ্জ্বল্যের মাঝখানে এসে বসেছেন, লাল যোহানেস্‌বুর্গ মদিরার বোতলটি তাঁর হাতে; সামনের টেবিলে শৌখীন কাচের নানা-আকারের গ্লাস, মাঝখানে বিচিত্রবর্ণ একগুচ্ছ টাটকা ফুলের তোড়া। ভদ্রলোকটির মুখের ছাঁদ কতকটা মঙ্গোলীয় ধরণের, পাকা গোঁফগুলি যত্ন ক'রে ছাঁটা; গোল মাথার উপর নিটোল

টাক্‌টি পালিশকরা পুরানো গজদন্তের মতো ঝক্‌ঝক্‌ করে, কথা বললে মুখের মধ্যে সোনাবাঁধানো দাঁতগুলি ঝিক্‌মিক্‌ ক'রে ওঠে। গৃহিণীটি তাঁর বিরাট দেহখানি নিয়ে বয়সোচিত অথচ বহুমূল্য বেশভূষায় সেজে ভারিক্কি চালে তাঁর স্বামীর পাশে গিয়ে বসলেন। হাল্কা রংএর হাওয়ার কাপড়ে নির্দোষ নির্লজ্জতার আভাস দিয়ে সেজে এলেন তাঁর সুন্দরী কন্যা, কুঞ্চিত চুলের গুচ্ছগুলি সযত্নে বেণীসম্বদ্ধ, নিঃশ্বাসে টাটকা ভায়লেট ফুলের সুগন্ধ; ছোট্ট একটি লাল তিল আছে ঠোঁটের নিচে, আর একটি আছে ঘাড়ের ঠিক মাঝখানে, পাউডারের অন্তরাল থেকে ঈষৎ মাত্রই তার আভাস পাওয়া যায়।···ডিনার সমাপ্ত হ'তে দুঘণ্টা সময় লাগে, তারপর নাচঘরে গিয়ে নাচের পালা। সেখানকার আমোদ-প্রমোদ সেরে পুরুষেরা চলে যান পানাগারে, সানফ্রানসিস্‌কোর সেই ভদ্রলোকটিও যান তাঁদের সঙ্গে, সকলে মিলে জমিয়ে বসেন টেবিলের উপর পা তুলে। নানারকমের গুরুগম্ভীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আলোচনা সেখানে জমে উঠতে থাকে, কত দেশের পর দেশ এবং জাতির পর জাতির ভবিষ্যৎ ভাগ্য সম্বন্ধে কত জটিল তথ্য আবিষ্কার করা হ'তে থাকে,—আর কথার মাঝে মাঝে হাভানা চুরুটের ধূমপান করতে করতে এবং মদের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে সকলের মুখমণ্ডল থেকে কান পর্যন্ত টক্‌টকে লাল হ'য়ে ওঠে। খুনখারাবি রংএর জ্যাকেটপরা নিগ্রো পরিচারকের দল অনবরত

এদের পানীয় যোগায়,—সিদ্ধ ডিমের খোলা সন্থ ছাড়িয়ে ফেললে যেমন দেখতে হয় তেমনিতরো সাদা তাদের চোখ, জোড়া জোড়া বেরিয়ে থাকে কালো চামড়ার ভিতর থেকে।

ওদিকে জাহাজের বাইরে অকুল সমুদ্রে উত্তাল তরঙ্গদল কালো পাহাড়ের মতো অনবরত ঠেলে ঠেলে উঠছে। মাঝে মাঝে হিমানী ঝটিকার ঝাপটা এসে জাহাজের দড়িদড়াগুলোতে এক এক ঝাঁকানি মেরে সোঁ সোঁ ক'রে গর্জে ওঠে। ঢেউয়ের সঙ্গে এবং ঝড়ের সঙ্গে যুঝতে গিয়ে সমস্ত জাহাজখানা থর্‌থর্ ক'রে কেঁপে ওঠে; ফেনশীর্ণ উত্তুঙ্গ ঢেউএর অবরোধশ্রেণী একটার পর একটা তার সামনে এসে দাঁড়ায়, সেগুলোকে চূর্ণ ক'রে দিয়ে জাহাজ আপন নির্দিষ্ট পথে এগিয়ে চলে, আর কুয়াশায় রুদ্ধকণ্ঠ হ'য়ে তার বাঁশি বারে বারে যেন ব্যাকুল হ'য়ে সতর্কধ্বনি করে। জাহাজের শেষপ্রান্তে প্রহরা-ঘরে একা দাঁড়িয়ে সতর্ক প্রহরী একাগ্রদৃষ্টিতে দূরের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে ঠাণ্ডায় জমে গিয়ে যেন পাগলের মতো হ'য়ে ওঠে। জাহাজের নিচেকার খোলটা অধিকাংশ জলের তলায় ডুবে আছে, তার ভিতরটা যেন নরকের সর্বনিম্নের স্তর, সেখানে অত্যন্ত গুমোট আর আলোআঁধারি করা একরকমের আবহাওয়া। সেখানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বয়লারগুলো সগর্জন অট্টহাস্য করতে করতে জ্বলন্ত মুখব্যাদান ক'রে রাশিরাশি কয়লা উদরস্থ করে, আর খালাসীরা অনবরত সেই কয়লা আগুনের মুখে যোগান দিতে

থাকে। এই সব খালাসীদের পেশীবহুল দেহ কোমর পর্যন্ত নগ্ন, কালিঝুলি মাখা গা দিয়ে তাদের দরবিগলিত ঘাম ঝরে, গন্‌গনে আগুনের আভায় তাদের মূর্তিগুলো অতি বিভীষণ দেখায়।

এদিকে জাহাজের উপর-তলায় পানাগারে যাত্রীরা পরম নিশ্চিন্তে চেয়ারে বসে টেবিলের উপর পা ছড়িয়ে দিয়ে গল্পে মেতে রয়েছে। তাদের পেটেণ্ট চামড়ার জুতা পালিশে চক্‌চক্‌ করে, মদের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে আর সুগন্ধি চুরুটের ধোঁয়ার কুণ্ডলী উড়িয়ে তারা অতি মার্জিত সুরুচিসম্পন্ন আলাপ-আলোচনা করতে থাকে। নাচঘরে গেলে দেখা যায় সেখানে আলোক উত্তাপ আর আনন্দ একত্র যেন ঘনীভূত, মেয়ে-পুরুষে মিলে জোড়ে জোড়ে সেখানে নাচতে শুরু করে। সেই নাচের তালে তালে যে সঙ্গীত বাজে তা কখনো হর্ষে কখনো বিষাদে নিতান্ত নিলাজ সুরে ফিরে ফিরে কেবল একটিমাত্র কামনাই জানায়, লোভনীয় কোন একটি সামগ্রীই বারে বারে যেন চাইতে থাকে। যাত্রীদের মধ্যে আছেন এক বৃদ্ধ রাজপ্রতিনিধি, ইনি সর্বদাই গম্ভীর প্রকৃতি; একজন আছেন ক্রোরপতি, লম্বা চেহারা, গোঁফদাড়ি কামানো, মধ্যবয়সী, পাদ্রীদের মতো লম্বা কোট পরা; একজন আছেন স্পেনদেশের খ্যাতনামা লেখক; একজন আছেন নামকরা সুন্দরী অভিনেত্রী, একটু বয়স বেশি হ'য়ে গেলেও রূপের জ্যোতি এখনও অক্ষুণ্ণ। আর আছেন এক নবীন-দম্পতি,—ওদের দুজনের দাম্পত্যলীলা আর অষ্ট-

প্রহর অঙ্গাঙ্গিভাব সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে; ওরা দুজনে পরস্পরকে নিয়েই মশগুল,—একসঙ্গে নাচে, একসঙ্গেই গান করে, অন্য কারো সঙ্গে মেশে না; ওদের এমন আশ্চর্য মনের মিল দেখে সকলেই মুগ্ধ, এই নিয়ে অনেক ইঙ্গিত আলোচনাও হয়। কিন্তু ওরা যে ষ্টীমার কোম্পানীর ভাড়া-করা দম্পতি, প্রেমের এইরকম অভিনয় দেখিয়ে যাত্রীদের চোখে চমক লাগিয়ে দিতে মোটা মাহিনায় নিযুক্ত হ'য়ে ওরা যে জাহাজে জাহাজে সর্বদা ঘুরে বেড়াচ্ছে, এ গোপনীয় খবরটা কেউ জানে না,—জানে কেবল কাপ্তেন।

জিব্রল্টারে পৌছে অনেকদিনের পর সূর্যের মুখ দেখে সকলেই খুব খুশি হোলো; সেখানে দেখা গেল যেন হঠাৎ একেবারে বসন্তের আবির্ভাব হয়েছে। ওখান থেকে এক বিশিষ্ট যাত্রী এসে জাহাজে উঠলেন। ইনি এশিয়ার কোন রাজপুত্র, দেশভ্রমণে বেরিয়েছেন ছদ্মবেশে; ছোটোখাটো মানুষটি, যেন কাঠে কোঁদা গড়ন, কিন্তু ভাবভঙ্গী কিছু চঞ্চল; মুখখানা চওড়া, চোখে সোনার চশমা, বড় বড় গোঁফ, পোষাকে খুব মার্জিত রুচির পরিচয় পাওয়া যায় না, কিন্তু ব্যবহারে বেশ সরল এবং শিষ্ট।

ভূমধ্যসাগরে প'ড়ে আবার বেজায় ঠাণ্ডা। স্বচ্ছ আকাশের নিচে বড় বড় ঢেউএর সারি শ্বেত ময়ূরপুচ্ছের মতো ফুলে ফেঁপে ফেনায় ফেনায় অত্যন্ত সাদা হ'য়ে প্রমত্ত হাওয়ার সঙ্গে

লাফিয়ে লাফিয়ে জাহাজের দিকে ছুটে আসতে লাগলো। তার পরের দিনে আকাশ মলিন হ'য়ে এল, দিগন্তে অস্পষ্ট একটা কালো রেখার আভাস দেখতে পাওয়া গেল, বোঝা গেল স্থল নিকটবর্তী। দূরবীক্ষণে ইস্কিরা ও কাপ্রি দ্বীপ নজরে এল, ক্রমে নেপল্‌সও দেখা গেল,—যেন ধূসর জমির স্তূপের উপর কতকগুলো চিনির দানা ছড়ানো, পিছনে তার বরফ ঢাকা লম্বমান পর্বতমালা। দেখবার জন্য উৎসুক হ'য়ে যাত্রীরা ডেকের উপর ভিড় ক'রে দাঁড়িয়েছে, মেয়েরা এবং পুরুষেরাও অনেকে নতুন হাল্কা পোষাক পরেছে। জাহাজের চীনা বয়গুলো আগুল্‌ফলম্বিত কালো পায়জামা প'রে ছোট ছোট পায়ে নিঃশব্দে আসা যাওয়া করছে, যাত্রীদের জামা ছড়ি ছাতা ও কুমীর-চামড়ার হাতব্যাগগুলো নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠছে, ফিস্ ফিস্ ক'রে পরস্পরে কি বলাবলি করছে।

সানফ্রানসিস্‌কোর ভদ্রলোকটির তরুণী কন্যা ঐ নবাগত রাজপুত্রের পাশে এসে দাঁড়ালো,—গত সন্ধ্যাতেই দুজনের পরিচয় হ'য়ে গেছে। রাজপুত্র আঙুল বাড়িয়ে কি যেন দেখাতে লাগলো, মেয়েটি একদৃষ্টে সেইদিকে চেয়ে রইলো। মাথায় খাটো ব'লে রাজপুত্রকে অনেকটা ছেলেমানুষের মতো দেখায়। সুপুরুষ বলা যায় না, বরং একটু অস্বাভাবিক রকমের চেহারা; গোঁফগুলো খোঁচালো আর ফাঁক ফাঁক, মুখের চামড়া তৈলাক্ত। মেয়েটি তাঁর কথাগুলো কান দিয়ে শুনছে বটে,

কিন্তু উত্তেজনায় তার কোনো কথার অর্থ বোধগম্য হচ্ছে না। রাজপুত্র যে কেবল তার সঙ্গেই কথা বলছে এই গর্বেই তখন বুকটা ভরে উঠেছে। রাজপুত্রের সব কিছুই একটু অসাধারণ রকমের,—তার অদ্ভুত ধরণের হাতগুলোর নগ্নতা, প্রাচীন রাজরক্তপ্রবাহিত তার দেহচর্মের মসৃণতা, এমন কি তার ইউরোপীয় ধরণের সাদা পোষাকটি পর্যন্ত। এই অচেনা দেশের মানুষটির সব কিছুতেই এমন এক বিচিত্র মোহ আছে যাতে নবীন নারীহৃদয় সহজেই আকৃষ্ট হয়। এদের থেকে খানিকটা তফাতে দাঁড়িয়ে সানফ্রানসিস্কোর সেই ভদ্রলোকটি, পরণে তাঁর দামী সিল্কের পোষাক, মাঝে মাঝে লোলুপদৃষ্টিতে চাইছেন অনতিদূরে দণ্ডায়মানা সেই নামজাদা সুন্দরী অভিনেত্রীর দিকে; কী সুন্দর ওর দীর্ঘ ঋজু দেহ, টাটকা গোলাপের মতো চমৎকার রং, প্যারিসের হালফ্যাশানে রঞ্জিত চোখের দুটি কালো ভুরু,—রূপার শিকল দিয়ে ধরে আছে একটি রোমশূন্য ছোট কুকুরকে, তাকেই সম্বোধন ক'রে কত কি আদরের কথা বলছে। ঐদিকে বাপের এইরকম লুব্ধদৃষ্টি হঠাৎ লক্ষ্য করেই ভদ্রলোকের মেয়েটি অপ্রস্তুত হ'য়ে এমনভাবে ঘুরে দাঁড়াল যেন বাপকে সে আদৌ দেখতে পায়নি।

আমেরিকান পর্যটকরা যে খুব ধনী হয় এবং বিদেশে গেলে তারা যে মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করে, একথা সকল দেশের লোকেই জানে। কাজেই বিদেশে এলেই তারা প্রত্যেকে যেমন দেখতে

পায়, সেই ভদ্রলোকটিও তেমনি দেখলেন যে এখানকার লোকেরা ভারী বাধ্য আর বিশ্বাসী, এদের কাজে কোনো রকমের ত্রুটি নেই, এরা দিনরাত অকুণ্ঠিতচিত্তে যাত্রীদের নানারকম ফরমাস খাটে, সামান্য প্রয়োজনটুকু পর্যন্ত আপনা থেকেই কেমন বুঝে নিয়ে সমস্ত বন্দোবস্ত করে দেয়, মালপত্র অতি সাবধানে নিয়ে যায়, যানবাহনের আশ্চর্যরকম সুব্যবস্থা করে। বিদেশীদের জন্য সর্বত্রই এমনি অনুগত সেবকের দল মজুত আছে, জাহাজেও এদের দ্বারা যথেষ্ট সুখসুবিধা পাওয়া গেছে, নেপ্‌ল্‌সে নামলেও সম্ভবত তার কোনো অভাব হবে না; সুতরাং ভাবনা করবার কিছুই নেই।

নেপ্‌ল্‌সের বন্দর নিকটবর্তী হ'য়ে এলো। ব্যাণ্ডবাদকের দল তাদের ঝক্‌ঝকে পিতলের বাদ্যযন্ত্রগুলো নিয়ে ঘাটের উপর সমবেত হয়েছিল, জাহাজ আসতেই হঠাৎ বাদ্যের তুমুল ঐক্যতান তুলে তারা সকলের কানে প্রায় তালা ধরিয়ে দিলে। বিশালদেহ কাপ্তেন তাঁর বিচিত্র পোষাকে জাহাজের ব্রিজের উপর দাঁড়িয়ে সাজানো ডলি-পুতুলের মতো হাত নেড়ে দূর থেকে যাত্রীদের বিদায়-অভিবাদন জানাতে লাগলেন। প্রত্যেক যাত্রীরই মনে হোলো যেন তাঁর সম্মানের জন্যেই ব্যাণ্ড বাজছে, কাপ্তেন বুঝি বিশেষ ক'রে তাঁকেই অভিবাদন করছে। অবশেষে জাহাজ যখন ঘাটে লাগলো এবং যাত্রী নামাবার সিঁড়ি পেতে দেওয়া হোলো তখন সে কী কোলাহল! দলে দলে যত

হোটেলের পোর্টার এবং প্রতিনিধিরা সোনার অক্ষরে নাম লেখা টুপি মাথায় এসে হাজির, যাত্রীদের তারা ছিনিয়ে নিয়ে যেতে চায়; নিষ্কর্মা ছোকরার দল, ছবির কার্ড হাতে গুণ্ডা-চেহারা গাইডের দল, সকলেই ঠেলাঠেলি ক'রে এদের চারিপাশে ভিড় ক'রে দাঁড়ালো। বিশেষ ক'রে ঐ সানফ্রান্‌সিস্‌কোর ভদ্র-লোকটির দিকে সকলেরই নজর, তাঁর কিছু কাজ করে দিয়ে চরিতার্থ হবার জন্য সকলেই মহা ব্যস্ত। একটু মৃদু হেসে এদের সবাইকে সরিয়ে দিয়ে যে-হোটেলে রাজপুত্র যাচ্ছেন সেই হোটেলের মোটরে গিয়ে তিনিও উঠলেন, গদির উপর উপবেশন ক'রে ভারিক্কি চালে বললেন—"চালাও।"

নেপল্‌সে পৌঁছে সুনিয়ন্ত্রিতভাবেই দিন কাটতে লাগলো। এখানকার হোটেলে খুব ভোরে উঠে অস্পষ্ট অন্ধকার থাকতেই ভোজনগৃহে ঢুকে প্রথম প্রাতরাশ সমাধা হয়, জানলা দিয়ে কন্‌কনে প্রভাতী হাওয়া গায়ে এসে লাগে; তখন থেকেই হোটেলের নিচে গাইডদের ভিড় জমতে থাকে। মেঘাচ্ছন্ন আকাশের প্রান্তে ম্লানহাসি হেসে নিষ্প্রভ সূর্যের উদয় হ'তে দেখা যায়,—সেই বাষ্পাচ্ছন্ন সূর্যকিরণে স্নাত ভিসুভিয়াস পর্বতশৃঙ্গ তখন হোটেলের উপরের বারান্দা থেকে কিছু কিছু দৃশ্যমান হ'য়ে উঠে, আর বিস্তীর্ণ জলরাশির অপরপারে বহু দূর দিগন্তের কোলে কাপ্রি দ্বীপের একটি ক্ষীণরেখাও তখন দৃষ্টিগোচর হয়। দূরের থেকে কাছের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে

আনলে দেখা যায় সমুদ্রোপকূলে প্রশস্ত বাঁধের উপর খর্বাকৃতি গাধাগুলো দু'চাকার গাড়ি টেনে মন্থরগতিতে চলেছে, কোথাও বা এক একটা সৈনিকের দল ব্যাণ্ড বাজিয়ে কুচ-কাওয়াজ করছে।

হোটেলের থেকে বেরিয়ে প্রথমেই ওদের কাজ হচ্ছে ট্যাক্সির আড্ডায় যাওয়া, তারপরে একখানা গাড়ি ভাড়া ক'রে নিয়ে মন্থরগতিতে বিরাট হর্ম্যশ্রেণীর মধ্য দিয়ে জনবহুল পথে পথে ঘুরে বেড়ানো। মাঝে মাঝে সমাধিস্থানের মতো প্রাচীন মিউজিয়মগুলি দেখতে নেমে যাওয়া, নতুবা গির্জায় গির্জায় খানিকটা ঘোরা,—তার সবগুলোই আকারে-প্রকারে প্রায় একই রকম; পর্দাঢাকা বিরাট তোরণদ্বার, ভিতরে ঢুকলেই বিপুল নিস্তব্ধতা, শূন্য বেদীর সুমুখে অসংখ্য মোমবাতি জ্বলছে, এক-পাশে সেই চিরপরিচিত ক্রুশাবতরণের প্রতিকৃতি, হয়তো কোনো নিঃসঙ্গ বৃদ্ধা অন্ধকারে নিরালায় বেঞ্চের এক কোণে কোথাও একা বসে আছে।···খানিকটা ঘোরাঘুরি ক'রে বেলা একটা বাজলে সান মার্টিনের বিখ্যাত হোটেলে গিয়ে লাঞ্চ খাওয়া,—কারণ অভিজাত সম্প্রদায়ের অনেকেই সেখানে যায়। একদিন সেই ভদ্রলোকের মেয়েটি এই হোটেলে ঢুকে হঠাৎ আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠলো, ভিড়ের মধ্যে তার মনে হোলো জাহাজের সেই রাজপুত্রটিও যেন এখানে এসেছে, যদিও ইতিপূর্বে সে সংবাদপত্রের মারফত জেনেছিল যে রাজপুত্র

নেপল্‌স ছেড়ে চলে গেছে রোমে। লাঞ্চের পরেই আবার এক চক্র ঘুরতে বেরুনো, বেলা পাঁচটা বাজলে নিজেদের থাকবার হোটেলে ফিরে গিয়ে গালিচা পাতা ঘরের কোণে আগুনের কাছে বসে শরীর গরম ক'রে নিয়ে পেয়ালা ভরে চা-পান করা। এর পরেই হবে রাত্রের ডিনার,—তখন হোটেলে ডিনারের ঘণ্টা বেজে উঠবে,আবার তেমনি নগ্নগ্রীব সুন্দরীর দল ঝাঁকে ঝাঁকে সাড়ম্বরে সিল্কের জামাকাপড়ে খস্‌খস্‌ করতে করতে সিঁড়ি বেয়ে নামতে থাকবে এবং উজ্জ্বল আলোকে তাদের বহুবিধ রূপসজ্জা আরো বহুলতর হ'য়ে চারিদিকের আয়না-গুলিতে প্রতিফলিত হ'য়ে উঠবে। আবার সেই মুক্তদ্বার সুসজ্জিত ভোজনাগার,—সেখানে একদিকে মঞ্চের উপর বসে আছে লালকোর্তাপরা ব্যাণ্ডবাদকের দল, নিচে কালো পোষাকে পরিবেশনকারীর দল ব্যস্ত হ'য়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের মাঝে একজন সর্দারগোছের লোক প্রত্যেক টেবিলে নিপুণহস্তে সূপ পরিবেশন ক'রে যাচ্ছে। সারাদিনের প্রোগ্রামের মধ্যে এই ডিনারটাই হচ্ছে সেখানকার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ঐ সময় প্রত্যেকেই এমন সাজসজ্জা ক'রে যাবে যেন কোনো বিবাহের উৎসবে এসেছে, এবং এই ডিনারে খাদ্য-পানীয় ও ফল-মিষ্টান্নের এতই বাহুল্য দেখা যাবে আর সকলে মিলে এতই তার সদ্ব্যবহার করবে, যে রাত্রি এগারোটার পরে যাত্রীদের প্রত্যেকের ঘরে ঘরে পেটব্যথা নিবারণের জন্য প্রত্যেই

নিয়মিত কতকগুলো গরমজলের ব্যাগ দিয়ে আসবার প্রয়োজন হবে।

সে-বছর ডিসেম্বর মাসটায় নেপ্‌ল্‌সে আমোদ-প্রমোদের মরসুম তেমন জমলো না, যেমন প্রতি বছর হয়। আবহাওয়াটা এমন বেয়াড়া হ'য়ে উঠলো যে এ সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন করলে হোটেলের চাকরবাকরের দলও যেন লজ্জা পেতো, মুখ মলিন ক'রে তারা বলতো নেপ্‌ল্‌সে এমন বিশ্রী দুর্বৎসর আর কখনো হয়েছে বলে তাদের মনে পড়ে না; অবশ্য কথাটা একেবারে খাঁটি সত্য নয়, আরো অনেকবার তাদের মুখে ঐ এক কথাই শোনা গেছে,—এবার বড় দুর্বৎসর। তারা প্রায়ই বলে, এবছর রিভিয়ারাতে অসম্ভব ঝড়বৃষ্টি হ'য়ে গেছে, এথেন্সে বেজায় বরফ পড়েছে, এমন কি এট্‌নাও বরফে একেবারে ঢেকে গেছে, স্বাস্থ্যান্বেষীর দল প্যালারমো থেকে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছে,—ইত্যাদি ইত্যাদি নানা দুঃসংবাদের কথা।......সূর্যদেব প্রতিদিন প্রভাত থেকেই নেপ্‌ল্‌সবাসীদের প্রবঞ্চিত করতে থাকেন। সূর্যোদয়ের পর একটু বেলা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গেই আকাশ মেঘে ছেয়ে ফেলে, গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়তে শুরু হয়, তারপর যতই বেলা যায় ততই বৃষ্টির জোর বাড়ে এবং ঠাণ্ডা পড়তে থাকে। হোটেলের দরজায় পামগাছের ঝাড়গুলো জলে ভেজা টিনের মতো চক্‌চক্‌ করে; সমস্ত শহরটাই কেমন মলিন, স্যাঁৎসেঁতে, কর্দমাক্ত,—মিউজিয়মগুলো ফাঁকা ফাঁকা,

সেখানে মোটেই তেমন লোকসমাগম নেই। ছ্যাকরাগাড়ির গাড়োয়ানেরা এক একটা কানঢাকা বর্ষাতি টুপি মাথায় চড়ায়, বাতাসে তার ভিজে কানগুলো লট্‌পট্‌ করতে থাকে,—বারে বারে নিবে-যাওয়া তাদের দগ্ধ চুরোটের প্রান্ত থেকে তীব্র একটা গন্ধ বেরোয়; নিস্তেজ ঘোড়াকে দ্রুতগামী করতে তারা যে চাবুকের আওয়াজ করে তাও যেন চাপা এবং নিস্তেজ, কেবল ট্রামরাস্তার পাথরের উপর পাহারাওয়ালার জুতার খট্‌খট্‌ শব্দ সজোরে প্রতিধ্বনিত হ'তে থাকে। কর্দমাক্ত পিছল পথে মেয়েরা মাথা অনাবৃত ক'রে দুহাতে কাপড় বাঁচিয়ে সাবধানে পথ চলতে থাকে, এমনভাবে চলতে তাদের মোটেই সুন্দর দেখায় না। সমুদ্রতীরে অনেক মরা মাছ ভেসে আসে, ওদিকে গেলেই তার পচা গন্ধ নাকে লাগে। সানফ্রানসিস্‌কোর সেই ভদ্রলোক আর তাঁর স্ত্রী সকাল থেকেই ঘরের মধ্যে নিষ্কর্মা হ'য়ে বসে থাকেন। তাঁদের কন্যাটি মাথাধরার অছিলায় বিষণ্নমুখে ঘুরে বেড়ায়, আবার একটু পরে আপনিই উৎফুল্ল হ'য়ে উঠে বাড়াবাড়ি হাসিখুশির ভাব দেখায়। হয়তো থেকে থেকে সেই বেঁটে রাজপুত্রটির কথা তার মনে পড়ে যায়; হয়তো সেই সঙ্গে অন্তরে তার কোনো একটা নবীন অনুভূতি জেগে ওঠে যা অপ্রত্যাশিত কিন্তু অনুপম। তরুণীর মন যখন একবার জাগে তখন সে রীতিমতই জাগে,—তখন যে-বস্তুর স্পর্শেই সে জেগে উঠুক, হয়তো বা অর্থসম্ভাবনা, হয়তো বা কিছু

খ্যাতি, হয়তো বা কিছু আভিজাত্যের মোহ আছে তার মূলে, কিন্তু তাতে জাগরণের আনন্দটুকুর কোনো ব্যতিক্রম হয় কি ?......

সকলেই বললে, সরেন্টোতে বা কাপ্রি দ্বীপে এরকম বিশ্রী দুর্যোগ নেই। সেখানে যথেষ্ট রৌদ্র পাওয়া যায়; আর লেবুর গাছগুলি এখন ফুলে ফুলে ভরা, সেখানকার লোকগুলিও সরল এবং উত্তম পানীয়ও সেখানে অজস্র মেলে। সুতরাং সানফ্রানসিস্কো-পরিবার স্থির করলেন যে তল্পিতল্পা বেঁধে তাঁরা সম্প্রতি কাপ্রিতেই যাবেন, সেখান থেকে পরে সরেন্টোতে গিয়ে উঠবেন। যাত্রাপথে তাঁরা টাইবেরিয়াসের প্রাসাদের ভগ্নস্তূপ দেখবেন, নীল গ্রোটোর প্রাচীন গুহাগুলিও দেখে যাবেন, আর আব্রুজির বিখ্যাত বাঁশি-বাজানোও একবার শুনবেন।

নেপ্‌ল্‌স পরিত্যাগ ক'রে যাওয়ার দিনটা ওদের চিরকাল মনে থাকবে। সেদিন সকালে একবারও সূর্যের মুখ দেখা গেল না। ঘন কুয়াশায় ভিসুভিয়াস পর্বত একেবারে ঢাকা পড়ে গেছে, সমুদ্রবক্ষেও কুয়াশার আবরণ, আধ মাইল দূরেও কিছু দেখা যায় না, কাপ্রি দ্বীপের কোনো চিহ্নই পাওয়া যায় না। ছোট যে ষ্টীমারটিতে ওরা উঠেছে সেটা এতই ভীষণ দোল খেতে লাগলো যে সানফ্রানসিস্কো-পরিবারের সকলেই সেলুনের সোফার উপর পাথরের মতো নিশ্চল হ'য়ে পড়ে

রইলো, একবারও মাথা তুলে চোখ চাইতে পারলে না। ওদের মধ্যে মহিলাটির সমুদ্রপীড়া সব চেয়ে বেশি, তাঁর মনে হ'তে লাগলো এতেই বুঝি তিনি মারা যাবেন। একটি পরিচারিকা মাঝে মাঝে এসে তাঁর পরিচর্যা করছিল, সে বারোমাস এই ষ্টীমারেই কাজ করে সুতরাং এমনি দোল খাওয়াই তার নিত্য অভ্যাস, যাত্রীদের মধ্যে সেই কেবল অটল ছিল এবং হাসিমুখে অক্লান্তভাবে সকলের সেবা ক'রে বেড়াচ্ছিল। ভদ্রলোকের কন্যাটি ভয়ে বিবর্ণ হ'য়ে একখণ্ড লেবু মুখে নিয়ে শুয়ে রইলো। সরেণ্টোতে গিয়ে পৌঁছলে ক্রিষ্টমাসের সময় রাজপুত্রের সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা হবে, এমন লোভনীয় সম্ভাবনাতেও ওর মনে তখন কোনো আনন্দ আসছে না। ভদ্রলোকটি নিজে ওভার-কোট আর টুপি সমেত বরাবর সটান চিৎ হ'য়ে শুয়ে রইলেন, সারাপথের মধ্যে একবারটিও উঠে দাঁতে কুটো কাটতে পারলেন না। অসুস্থতায় তাঁর লাল মুখখানা কালি হ'য়ে গেল, মাথার পাকা চুলগুলো কুৎসিতভাবে এলোমেলো হ'য়ে রইল, দারুণ মাথা-ধরার যন্ত্রণায় তিনি অস্থির হ'য়ে উঠলেন। বৃষ্টির দরুণ কিছুদিন আগের থেকে তাঁর মদ্যপানের মাত্রা কিছু অতিরিক্ত হচ্ছিল, উপর্যুপরি অনেকবার সীমা লঙ্ঘন করা হ'য়ে গেছে, তার কুফলটা এখন টের পাওয়া যাচ্ছে।···কেবিনের খড়খড়িতে বৃষ্টির ঝাপটা সজোরে এসে আঘাত করছে, খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে জল গড়িয়ে টপ্‌টপ্‌ ক'রে সোফায় পড়ছে, মাস্তুলে ঝড়ের দাপট

লেগে গোঁ গোঁ শব্দ করছে, ঠেউএর ধাক্কায় ষ্টীমার বারবার কাৎ হ'য়ে যাচ্ছে আর নিচেকার তলার ভারী-ভারী মালগুলো গড়গড়্ শব্দে এপাশ থেকে ওপাশে গড়াচ্ছে। এক একটা ঘাটে গিয়ে যখন ষ্টীমার ভিড়ছে তখন তবু কিছুক্ষণের জন্যে নিষ্কৃতি। কিন্তু দোলার একটুও বিরাম নেই ; জানলা দিয়ে চাইলেই দেখা যায় তীরের যত গাছপালা বাগান বাড়ি পাহাড় ক্রমাগত উঠছে আর নামছে, সবই যেন নাগরদোলায় দুলছে। ঢেউএর চোটে ষ্টীমারের সঙ্গে কাছাকাছি নৌকাগুলোর ঠোকাঠুকি লেগে যাচ্ছে, ষ্টীমারের লোকেরা সজোরে চীৎকার ক'রে তাদের সাবধান করছে। কোথায় একটা শিশু এমনি তারস্বরে কাঁদছে যেন এখনি তার দমবন্ধ হ'য়ে যাবে। দরজা দিয়ে কন্‌কনে ভিজে হাওয়া আসছে। "রয়্যাল হোটেল" নিশান-দেওয়া একখানা ডিঙি-নৌকা ঢেউয়ে আন্দোলিত হ'তে হ'তে দূর থেকে এগিয়ে আসছে, একটা লোক যাত্রী আকর্ষণ করবার জন্যে তার উপর দাঁড়িয়ে অনবরত চীৎকার করছে— "রয়্যাল হোটেল", "রয়্যাল হোটেল"। লোকটার ভঙ্গি দেখে এবং বিকট চীৎকার শুনে সানফ্রানসিস্কোর সেই ভদ্রলোকটির মন ঘৃণায় বিরক্তিতে ভরে উঠলো। মনে হোলো ইটালীয় মাত্রই বুঝি এমনি কাণ্ডজ্ঞানশূন্য বর্বর, নির্বোধ, অর্থলোভী। একটা ঘাটের কাছে ষ্টীমার থামলে তিনি একবার মাথা তুলে চেয়ে দেখলেন জলের ধারেই রয়েছে পাহাড়, তার গায়ে থাকে-

থাকে রয়েছে পায়রার খোপের মতো ছোট ছোট গুহা, সেগুলো একেবারে শ্রীছাঁদবিহীন নোংরা স্যাঁৎসেঁতে, তার মধ্যেও মানুষ অনায়াসে বাস করছে; ওর আশেপাশে ছেঁড়া কাপড় ঝুলছে, ভাঙা টিনের কৌটা প্রভৃতি ইতস্তত ছড়ানো, অনেক মাছধরা জাল শুকোচ্ছে। এ কী অপরূপ ইটালিই তিনি এতদূর থেকে দেখতে এসেছেন, ভেবে মনটা বিতৃষ্ণায় ভরে গেল।……

অবশেষে সন্ধ্যার সময় কাপ্রি দ্বীপের কালো আবছায়া দেখা দিল, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলোকবিন্দু মাথায় নিয়ে সেটা যেন বিরাট আকারে এইমাত্র জল থেকে ভেসে উঠলো। ঝড়ের বেগ ক্রমশ মন্দীভূত হ'য়ে এল, তরঙ্গবিক্ষোভ অনেকটা শান্ত হোলো। তীরের আলোর সোনালি রশ্মিগুলো রেখায় রেখায় লম্বমান হ'য়ে জলের উপর কাঁপতে লাগলো।…নোঙর ফেলার সঙ্গে সঙ্গে খালাসীরা কোলাহল ক'রে উঠলো, তখন সকলেই যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো। কেবিনের আলো উজ্জ্বলতর হ'য়ে উঠলো, ক্ষুধাতৃষ্ণার কথা আবার সকলের স্মরণ হ'তে লাগলো।…

মিনিট দশেকের মধ্যে সানফ্রানসিস্‌কো-পরিবার একটা বোটে নামলো, বোট থেকে ডাঙায় উঠে তারা ছোট রেল গাড়ীতে চড়ে বসলো। পাহাড়ের গা বেয়ে ঘুরে ঘুরে রেলগাড়ি উপরে উঠতে লাগলো,—আঙুরের ক্ষেতের গা ঘেঁষে, কমলা কমলালেবুর বাগানের পাশ দিয়ে, বৃষ্টিস্নাত সবুজ ঘন-

ঝোপের ধার দিয়ে।…বৃষ্টিশেষে ইটালির মাটিতে কী মিষ্ট সুগন্ধ, এ আশ্চর্য সৌরভটুকু বুঝি এ-দেশেরই একান্ত নিজস্ব!

মেঘে বৃষ্টিতে কাপ্রিদ্বীপও সেদিন অন্ধকার এবং মলিন, কিন্তু যাত্রীদের ষ্টীমার আসবার দরুণ সর্বত্র আলো জ্বালা হয়েছে, তাই চতুর্দিক তখন কৃত্রিম আলোকে উদ্ভাসিত। শহরে যেতে নামতে হয় একটা পাহাড়ের উপরকার ষ্টেশনে, সেখানে ঐ ভদ্রলোকদেরই জিনিসপত্র নিয়ে যাবার জন্যে আগের থেকে অনেক লোক নিযুক্ত হ'য়ে ভিড় ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। ওদের সঙ্গে আরো অনেকে ট্রেণ থেকে নামলো বটে, কিন্তু তাদের মধ্যে তেমন উল্লেখযোগ্য কেউ ছিল না। কয়েকজন রাশিয়ান, তারা কাপ্রিতেই বাস করে, অতি সাধারণ বেশভূষা এবং গরিবানা চাল; আর কয়েকজন দীর্ঘদেহ জার্মান যুবক, প্রত্যেকের পিঠের উপর মোট বাঁধা, তারা কারো সাহায্যও চায় না, সিকিপয়সা বাজে খরচও করে না। সানফ্রানসিস্কোর ভদ্রলোক ট্রেণ থেকে নেমে একটু তফাতে দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁকে দেখবামাত্রই সকলে চিনতে পারলে। তখন তাড়াতাড়ি ক'রে মেয়েদের নামিয়ে নেওয়া হোলো, তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে অনেকে শশব্যস্ত হ'য়ে উঠলো। তাঁরা যখন অগ্রসর হ'য়ে চললেন তখন নিষ্কর্মা যত ছোকরার দল ভিড় ক'রে তাঁদের পিছু নিলে; বলিষ্ঠদেহা কুলিরমণীরা তাঁদের মোট মাথায় নিয়ে আগে আগে চলল। তীব্র ইলেকট্রিক আলোতে

স্টেশনের প্ল্যাটফর্মটা দেখাচ্ছিল যেন থিয়েটারের একটা স্টেজের মতো, শ্রেণীবদ্ধ কুলিরমণীদের কাষ্ঠপাদুকা তার উপর খট্‌খট্‌ ক'রে বেজে চলেছে। কিছু বকশিশের লোভে নিষ্কর্মা ছোঁড়াগুলো সানফ্রানসিস্‌কোর সেই ভদ্রলোকের আশেপাশে শিস দিয়ে দিয়ে হরদম্‌ ডিগবাজি খেতে শুরু ক'রে দিলে, তিনি সেদিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র না ক'রে স্টেজের অভিনেতার মতো দৃপ্তভঙ্গিতে পাহাড়ের ঢালু বেয়ে উপরে উঠতে লাগলেন। রাজপথের তোরণ পার হ'য়ে নানারকমের অলিগলি এবং বাড়িঘর পার হ'য়ে অবশেষে তাঁরা আলোকোজ্জ্বল এক মস্ত হোটেলের দ্বারে এসে পৌঁছলেন। এখানে পৌঁছেই বোধ হোলো যেন ওঁদের অভ্যর্থনা করবার জন্যেই এই ছোটো দ্বীপটির অধিবাসীরা সকলে মিলে সেখানে জুটেছে, স্বয়ং হোটেলের অধিকারীও এঁদের অতিথিরূপে পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত। হোটেলের প্রকাণ্ড চীনা-ঘড়িটাও যেন এঁদের অপেক্ষাতেই এতক্ষণ পর্যন্ত চুপ করেছিল, যেমনি এঁরা ভিতরে প্রবেশ করলেন অমনি সেটা মুখরিত হ'য়ে ঢং ঢং ক'রে বেজে উঠলো।

হোটেলের তরুণ অধিকারী মানুষটি অত্যন্ত বিনয়ী, বেশ-ভূষায় সর্বদা ফিট্‌ফাট্‌ এবং আদবকায়দায় চোস্ত, কিন্তু তাকে প্রথমদৃষ্টিতে দেখেই সানফ্রানসিস্‌কোর ভদ্রলোকটি চম্‌কে উঠলেন। গতরাত্রে ঠিক এই লোকটিকেই তিনি দেখেছিলেন স্বপ্নে—ঠিক এমনি ফিট্‌ফাট্‌ পোষাক পরা, এমনি চক্‌চকে

মাথার চুল পরিপাটিভাবে উল্টাদিকে পাটকরা, সমস্তই হুবহু মিলে যায়। ওকে দেখে অবাক হ'য়ে তিনি প্রথমে কেমন একটু থতমত খেয়ে গেলেন। কিন্তু সে কেবল মুহূর্তের জন্য; অলৌকিক ব্যাপার নিয়ে মানুষের মনে যা-কিছু সংস্কার কিংবা দুর্বলতা থাকে তা বহুকাল আগেই তিনি মন থেকে ঘুচিয়ে দিয়েছেন, সুতরাং আশ্চর্যের ভাবটা একবার জেগেই তখনি মিলিয়ে গেল। স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তবের এমন এক একটা কাকতালীয় মিল হ'য়ে যায়, তারই দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে এই তুচ্ছ ব্যাপারটার কথা,—হোটেলের বারান্দা পার হ'য়ে যাবার সময় ভদ্রলোক নিজের স্ত্রী-কন্যাকে হাসতে হাসতে একথা শুনিয়ে দিলেন। কন্যাটি কিন্তু এই শুনেই খুব ভয় পেয়ে গেল। তার প্রাণটা যেন একবার আকুলিবিকুলি ক'রে উঠলো, এই অচেনা বিদেশে অহেতুক তার নিজের দেশের জন্যে কান্না পেতে লাগলো। অবশ্য এইরকম মনের ভাবটা সেও তৎক্ষণাৎ চেপে গেল।

কে একজন কোথাকার রাজা সম্প্রতি বেড়াতে এসে এই হোটেলের যে ঘরগুলিতে তিন সপ্তাহ ছিলেন, সেই ঘরেই এঁদের স্থান দেওয়া হোলো। এঁদের পরিচর্যায় নিযুক্ত হোলো সকলের চেয়ে প্রিয়দর্শনা একজন নিপুনা পরিচারিকা, খাস কর্তার জন্যে নিযুক্ত হোলো হোটেলের সবচেয়ে পুরানো সেরা চাকরটি, তাছাড়া ফাই-ফরমাস খাটবার জন্যে দরজার কাছে

সর্বদা হাজির রইলো লুইগি নামে এক স্ফূর্তিবাজ ছোকরা। কয়েক মিনিট পরেই রন্ধনশালার অধ্যক্ষ নিজে এসে খাদ্যতালিকা পেশ ক'রে জিজ্ঞাসা করলে ওঁরা ডিনার খেতে নিচে যাবেন কিনা। ষ্টীমারের দোলা খাওয়ার জের ওঁদের তখনো মেটেনি, পায়ের তলার মেঝেটা যেন তখনো দুলছে। কিন্তু তবু আভিজাত্যের ঠাট সম্পূর্ণ বজায় রেখে সোজা দাঁড়িয়ে ভারিক্কি গলায় কর্তা আদেশ দিলেন যে ডিনার খেতে তাঁরা নিশ্চয়ই যাবেন, তাঁদের টেবিলটা যেন দরজার কাছ থেকে খানিকটা দূরে স্বতন্ত্র জায়গায় রাখা হয়, এবং তাঁরা স্থানীয় উৎকৃষ্ট শ্যাম্পেন ছাড়া আর কিছু পান করবেন না। প্রত্যেকটি কথায় ঘাড় নেড়ে অধ্যক্ষ জানিয়ে দিলে যে তাঁর আদেশ সমস্তই সে স্মরণ রাখবে। কর্তার বক্তব্য শেষ হ'লে সে অতি বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করলে—"আরো কিছু হুকুম আছে ?"

"না"। শুনে সে তখন বললে—"আজ রাত্রে এখানে বিখ্যাত কামেলা ও জুসেপের ট্যারাণ্টেলা নাচ হবে। আপনারা দেখবেন।"

ভদ্রলোক যেন একটু তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন—"ও এই নাচওয়ালী মেয়েটির অনেক ছবি কাগজে দেখেছি বটে। জুসেপে লোকটা আবার কে, ওর উপপতি গোছের কেউ হবে বুঝি ?"

"আজ্ঞে না, তার আপন ভাই হয়।"

ভদ্রলোক চুপ ক'রে থেকে খানিকক্ষণ কি যেন ভাবলেন, মুখে কিছু বললেন না, তারপর লোকটিকে বিদায় দিলেন। এর পরেই তিনি এমনভাবে প্রস্তুত হ'তে লাগলেন যেন বর সেজে বিয়ে করতে যাচ্ছেন। ঘরের সব উজ্জ্বল আলোগুলি জেলে দিলেন, সযত্নে দাড়ি কামালেন, মুখ হাত ধুয়ে এলেন, ঘণ্টা বাজিয়ে চাকরকে নানান রকম ফরমাস করতে লাগলেন। পাশের ঘর থেকে তাঁর স্ত্রী এবং কন্যাও নানা প্রয়োজনে বারে বারে ঘণ্টাধ্বনি করছে, লুইগি পা টিপে টিপে নিঃশব্দে ছুটোছুটি করছে; ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে সে বিষম গাম্ভীর্যের নকল ক'রে এমন একটা কর্মব্যস্ততার ভাব দেখাচ্ছে যে হোটেলের পরিচারিকার দল তাই দেখে হাসি চেপে রাখতে পারছে না। বাইরের থেকে কাচের আধারে জল ভরে নিয়ে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করবার সময় দরজার কাছে থমকে দাঁড়িয়ে নিতান্ত ভালমানুষটির মতো মৃদু মৃদু টোকা দিয়ে কত যেন ভয়ে ভয়ে প্রত্যেকবার সাড়া নিচ্ছে—"আসতে পারি হুজুর?"

ভিতর থেকে জবাব আসছে—"হাঁ, এসো।"

*   *   *   *

সেই সন্ধ্যায় ভদ্রলোকটি একবারও মনে মনে কিছু কি জানতে পেরেছিলেন, কোনোরকম আসন্ন বিপদ-সম্ভাবনার কথা? সম্ভবত তেমন কিছুই তিনি টের পাননি। এখনই যা ঘটবে,

আগের থেকে তার কিছুই জানা যায় না। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় পৃথিবীটা যেমন একই রকমের সহজ গতানুগতিকভাবে চলে যাচ্ছে তেমনি বুঝি চিরকাল যাবে। অতএব যদিও তিনি অন্তরে অন্তরে কোনো-কিছুর আভাস পেয়ে থাকেন, সঙ্গে সঙ্গেই হয়তো নিজের মনকে তিনি এই ব'লে প্রবোধ দিয়েছেন যে যাই হোক না কেন, আজই এখনই হঠাৎ কিছু ঘটছে না। ষ্টীমারে থাকতে সমুদ্রপীড়ার জন্য অনেকক্ষণ উপবাসের পর তাঁর তখন দারুণ ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছে, ডিনারে বসে লোভনীয় খাদ্যের প্রথম চামচটা কতক্ষণে মুখে তুলবেন উৎফুল্লচিত্তে তারই প্রত্যাশা করছেন, তাড়াতাড়ি তাই সাজগোজ সেরে নিয়ে ডিনারে যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন, তখন অত কাল্পনিক ভবিতব্যের কথা নিয়ে ভাবতে বসার সময় নয়।

দাড়ি কামানো শেষ ক'রে তিনি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বাঁধানো দাঁতগুলি মুখের মধ্যে পরিয়ে নিলেন, মাথার আশেপাশে যা কিছু চুল ছিল সেগুলি ভিজিয়ে বুরুষের দ্বারা টেনে টেনে সযত্নে টাকের উপর যথাসম্ভব ঢাকা দিয়ে দিলেন। সিল্কের আণ্ডারওয়ারটা পা গলিয়ে টেনে নিয়ে পেটের মেদপিণ্ডের উপর পর্যন্ত ঢাকা দিয়ে পায়ে মোজা চড়ালেন, পেটেণ্ট চামড়ার চক্‌চকে জুতা পরলেন। একখানা দুধের মতো সাদা শার্ট বের ক'রে পরা হোলো, তার হাতায় বোতাম লাগানো হোলো, শার্টের উপর প্যাণ্ট আঁটা হোলো,—অবশেষে গলায়

শক্ত কলার দিয়ে তাতে বোতাম লাগাতে গিয়ে তিনি হিমসিম খেয়ে উঠলেন। তখনো ঠিক স্থির হ'য়ে দাঁড়াতে পারছেন না, পায়ের তলার মাটি তখনো দুলছে। কলারের ফুটার মধ্যে বোতাম পরাতে গিয়ে আঙুলের ডগা অসাড় হ'য়ে যাচ্ছে, বোতামের চাপে গলার লোল চামড়া এক এক বার চিম্‌টে যাচ্ছে, তবু নিষ্কৃতি নেই। বহু কষ্টে মুখখানা নীলবর্ণ করে চোখ দুটো ঠিক্‌রে বের করে অনেকক্ষণ পরে যখন এই দুরূহ কাজটি সমাধা হোলো তখন তিনি ক্লান্ত হ'য়ে বসে পড়লেন। ঘরের চারিপাশে একবার চেয়ে দেখলেন, আভূমিলম্বিত আয়না-গুলোতে তাঁর তখনকার মূর্তিটা চারিদিকেই আপাদমস্তক প্রতিফলিত হ'য়ে উঠেছে।

"কী মুশকিল!"—মাথাটা নিচু করে তিনি তখন বলে উঠলেন—"কী মুশকিল!" মুশকিলটা যে কোথায় তা অবশ্য মনে মনে উহ্যই রয়ে গেল। নিজের হাতের ছোট ছোট আঙুলগুলোর প্রান্তে বড় বড় নখগুলোকে একমনে নিরীক্ষণ করতে করতে আরো কয়েকবার এমনি স্বগত উক্তি করে বলে উঠলেন—"কী মুশকিল!"

হঠাৎ হোটেলের চারিদিক প্রতিধ্বনিত করে ডিনারের ঘণ্টা বেজে উঠলো। ভদ্রলোক তখন তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালেন, গলার টাই ধরে টেনে শক্ত কলারটা আরো একটু আঁট করে দিলেন, ভেস্টের বোতামগুলো সমস্ত এঁটে দিলেন, শার্টের

হাতাগুলো কোটের অন্তরাল থেকে টেনে বের করে নিলেন, আরো একবার আয়নার দিকে চেয়ে সাজগোজটা দেখে নিলেন। সেই সময় মনে মনে একবার এ-কথাও ভাবা হ'য়ে গেল—"আজ দেখা যাবে সেই নর্তকী কামেলাকে,—নিবিড়বর্ণা সুন্দরী, ভাসা ভাসা চোখ দুটিতে এক রকমের মৌন লিপ্সার দৃষ্টি, অর্ধনগ্না দোআঁশলা জংলী মেয়ের মতো নৃত্যোপযোগী পোষাকে সেজে নিশ্চয়ই কত চমৎকার নাচ দেখাবে—"

প্রফুল্লচিত্তে নিজের কামরা থেকে তিনি মেয়েদের কামরার দিকে চললেন, বন্ধ দরজার কাছে গিয়ে হাঁক দিলেন—"এসো, তোমরা তৈরি হয়েছো ?"

ভিতর থেকে চপলস্বরে কন্যার জবাব এলো—"আর পাঁচ মিনিট বাবা, এই সবে চুলটা জড়াচ্ছি।"

"আচ্ছা আচ্ছা, তৈরি হ'য়ে নাও, আমি আগে যাচ্ছি"—বলে তিনি ফিরলেন। প্রসাধনকক্ষে মেয়ের লম্বা চুলের রাশি মাটি পর্যন্ত লুটিয়ে পড়ছে, কিছুতেই সে চুল নিয়ে সামলাতে পারছে না,—এই দৃশ্যটা কল্পনার চোখে দেখতে দেখতে মৃদু পদক্ষেপে বারান্দা পার হ'য়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে চললেন তিনি হোটেলের পাঠাগারের দিকে। চাকর-বাকর যে কেউ সামনে পড়ছে সকলে তফাতে সরে গিয়ে সসম্মানে তাঁকে পথ ছেড়ে দিচ্ছে, আর কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করে তিনি সটান চলেছেন। এক বৃদ্ধ যাচ্ছিল সেখান দিয়ে,—বয়সের

ভারে নুয়ে পড়েছে, চুলগুলি সমস্তই ধবধবে সাদা দুধের মতো, তবু সিল্কের পোষাকের বাহার যথেষ্টই আছে, ডিনারের দেরী হ'য়ে গেছে ভেবে হাস্যকর অঙ্গভঙ্গি সহকারে তাড়াতাড়ি চলবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে,—ভদ্রলোক অনায়াসে তার পাশ কাটিয়ে অগ্রসর হ'য়ে গেলেন। ভোজনাগারে তখন অনেকে ডিনারে বসে গেছে, পাঠাগারে যাবার পথে তিনি সেখানে ঢুকে কাউণ্টার থেকে একটা চুরোট কিনে পাশের জানলায় গিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। বাইরের অন্ধকার ভেদ ক'রে একটা মৃদু বাতাসের হিল্লোল এসে তাঁর মুখেচোখে লাগলো ; দূরে দেখা গেল একটা নারিকেল গাছ—কালো আবছায়া মূর্তি নিয়ে যেন একটা দৈত্যের মতো নক্ষত্র-মণ্ডলীর মাঝে মাথা তুলে নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

পাশেই পাঠাগার। সেখানে ঢুকে ভদ্রলোক দেখলেন, লম্বা টেবিলের উপর সারি সারি আলো জ্বলছে, সবগুলিতেই সবুজ শেড্ দেওয়া। সেখানে চশমা-চোখে একজন জার্মান, এলোমেলো পোষাকে অনেকটা যেন ইব্সেনের চেহারার মতো দেখতে, একা একপাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনবরত সংবাদপত্র-গুলোর পাতা ওল্টাচ্ছে। অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তার দিকে একবার চেয়ে সানফ্রানসিস্কোর সেই ভদ্রলোক একটা আলোর কাছে গদি-আঁটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন, পকেট থেকে নিজের চশমাটি বের ক'রে পরলেন এবং গলাটা খানিক উঁচু ক'রে

(কারণ টাইট-কলারের জন্যে গলায় তখনো লাগছিল) গম্ভীর ভাবে একখানা সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় মনোনিবেশ করলেন। কাগজটা খুলে প্রথমেই তিনি একবার বড় বড় হেডিংগুলোতে চোখ বুলিয়ে যুদ্ধের মোটামুটি সংবাদটা জেনে নিলেন, তারপর অভ্যাসমতো যেমন প্রথম পৃষ্ঠা উল্টে দিলেন,···আচম্বিতে ছাপার লাইনগুলো তাঁর চোখের সামনে ঝল্‌সে উঠলো, নিঃশ্বাস আট্‌কে হঠাৎ যেন তাঁর দম বন্ধ হ'য়ে গেল, চোখ দুটো দারুণ বিস্ফারিত হ'য়ে উঠলো, চশমাটা নাক থেকে খুলে পড়ে গেল, শরীরটা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লো, নিঃশ্বাস নেবার প্রবল চেষ্টায় তিনি একটা বিকট শব্দ ক'রে উঠলেন। দেখতে দেখতে তখন চিবুকটা ঝুলে পড়লো, সোনার দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়লো, ঘাড়টা একপাশে দুমড়ে গেল,—এবং বিশাল সেই দেহটা যেন কোনো অদৃশ্য শত্রুর কবল থেকে মুক্ত হবার জন্যে অন্তিম-প্রয়াসে ধ্বস্তাধ্বস্তি করতে করতে চেয়ার থেকে গড়িয়ে সশব্দে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো।···

জার্মান লোকটি যদি সেখানে উপস্থিত না থাকতো তাহ'লে এই নিয়ে কিছুই হৈ-চৈ হোতো না। দুর্ঘটনার ব্যাপারটা একদম চাপা রেখে তখনই চুপিচুপি ভদ্রলোকের দেহটা একপাশ দিয়ে কোথাও সরিয়ে ফেলা হোতো, ডিনারে উপস্থিত আগন্তুকরা বিশেষ কিছু জানতেও পেতো না। কিন্তু ঐ জার্মানটি হঠাৎ এই কাণ্ড দেখে ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলো

এবং উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটাছুটি ক'রে ভোজনাগারের মধ্যে ঢুকে সকলকে সচকিত ক'রে তুললে। ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে সকলেই নিজের নিজের টেবিল ছেড়ে উঠে পড়লো, হট্যগোলের মধ্যে অনেক চেয়ার উল্টে সশব্দে পড়ে গেল, বিভিন্ন রকমের ভাষায় "কী হয়েছে, কী হয়েছে" বলতে বলতে সকলেই তখন ভিড় ক'রে পাঠাগারের দিকে ছুটলো। সকলেই প্রশ্ন করে, সকলেই জানতে চায় প্রকৃত রহস্যটা কি, কিন্তু এটা যে মৃত্যু এই সহজ কথাটা কেউ সহজে বুঝতে পারলে না, সত্যিকার খবরটা কেউ কাউকে দিতে পারলে না। আজও পর্যন্ত মানুষ মৃত্যু সম্বন্ধে যত আশ্চর্য হ'য়ে ওঠে, এমন আর কিছুতে না, এই নিত্যকার সুনিশ্চিত ঘটনাটাকে যেন কিছুতে বিশ্বাসই করতে চায় না। হোটেলের মালিক মহা ব্যস্ত হ'য়ে সকলকে ডিনারের ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে বারম্বার সাধাসাধি করতে লাগলো,—এই ব'লে সকলকে বোঝাবার চেষ্টা করতে লাগলো যে তেমন গুরুতর কিছুই হয়নি, সানফ্রানসিস্কো থেকে যে ভদ্রলোকটি এসেছিলেন তিনি হঠাৎ কিরকম অজ্ঞান হ'য়ে পড়েছেন। কিন্তু কেউ তার কথা গ্রাহ্য করলে না, ঘটনাস্থলে ভিড় ক'রে বহুলোক কৌতূহলের সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো সেখানে কি হচ্ছে। হোটেলের লোকেরা তাড়াতাড়ি ঐ ভদ্রলোকের গলা থেকে টাই আর কলার টেনে খুলে দিলে, কোট এবং ভেস্ট খুলে বের ক'রে নিলে, তারপর পা থেকে

জুতো দুটো খুলে ফেলবার জন্যে একসঙ্গে অনেকে টানাটানি করতে লেগে গেল, যেন এতেই তিনি সুস্থ হ'য়ে উঠবেন। ভদ্রলোকটিও তখন হাত পা খিঁচে মৃত্যুর সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি করছেন, হঠাৎ এমন বেকায়দায় আক্রান্ত হ'য়ে মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পণ করতে যেন সহজে রাজি নন। ঘন ঘন মস্তক আন্দোলন করছেন, গলায় ঘড়্ঘড়্ ক'রে একরকম শব্দ করছেন, খোলা চোখে উন্মত্তের মতো চারিদিকে আকুলভাবে চাইছেন। শেষে তাঁকে ধরাধরি ক'রে যখন ৪৩ নম্বরে নিচেকার একটা স্যাঁৎসেঁতে অন্ধকার ঘরের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হোলো, তখন খবর পেয়ে অসম্বদ্ধ-বেণী অনাবৃত-বক্ষ আর অসম্বৃত-বস্ত্রে তাঁর তরুণী কন্যা আলুথালু অবস্থায় সেখানে ছুটে গিয়ে হাজির হোলো। কিছু পরে এলেন তাঁর বিন্যস্তবেশা বিপুলকায়া স্ত্রী, ভয়ে তাঁর মুখখানা বীভৎস হ'য়ে উঠেছে,—কিন্তু ততক্ষণে ধ্বস্তাধ্বস্তিও থেমে গেছে।

প্রায় আধঘণ্টার মধ্যেই সমস্ত গোলমাল মিটে গিয়ে হোটেলের আবহাওয়া অনেকটা স্বাভাবিক হোলো, কিন্তু সেদিনকার সন্ধ্যার আনন্দটা একদম মাটি হ'য়ে গেল। আগন্তুকরা মৌন বিরক্তির সঙ্গে কোনোরকমে ডিনার খাওয়া শেষ ক'রে নিলে। হোটেলের মালিক যেন অপরাধীর মতো শুষ্কমুখে সকলের কাছে ঘোরাফেরা করতে লাগলো, বারবার ক'রে বলে বেড়াতে লাগলো যে হোটেলের অতিথিদের কাউই

না অসুবিধা হচ্ছে, যত শীঘ্র এই জঞ্জাল হোটেল থেকে দূর করা যায় সেজন্যে সে প্রাণপণে চেষ্টা করবে। কামেলার নাচটা বন্ধ ক'রে দেওয়া হোলো, বাড়তি আলোগুলো নিবিয়ে দেওয়া হোলো, ডিনারের পর সকলে নিঃশব্দে পানাগারে চলে গেল। সমস্ত বাড়িটা ক্রমে এমন নিস্তব্ধ হ'য়ে গেল যে ঘড়ির টিক্‌টিক্ শব্দটি পর্যন্ত স্পষ্ট শোনা যায়। হোটেলের কাকাতুয়াটা কয়েকবার অনাবশ্যক চেঁচিয়ে উঠলো, শেষে সেও নিস্তব্ধ হ'য়ে ঘুমিয়ে পড়লো।···

সানফ্রানসিস্কোর সেই ভদ্রলোক একটা ভাঙা লোহার খাটের উপর পড়ে আছেন। ময়লা একখানা কম্বলে শরীরটা ঢাকা দেওয়া হয়েছে, ঘরে মিট্‌মিট্ ক'রে একটা বাতির আলো জ্বলছে। মাথায় আইস্‌ব্যাগ চাপানো রয়েছে,—মুখখানা মৃত্যুনীল, হিমাভ। মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস পড়ায় এতক্ষণ ওষ্ঠপ্রান্তে যে বুদ্‌বুদের মতো একটা শব্দ হচ্ছিল তাও ক্রমে বিলীন হ'য়ে গেছে, গলায় হয়তো সামান্য একটু শব্দ পাওয়া যায় মাত্র। মানুষ আর এখন ঐ দেহে নেই, যা রয়েছে সে ভিন্নজাতীয় সামগ্রী। স্ত্রী, কন্যা, স্থানীয় ডাক্তার এবং হোটেলের কয়েকজন লোক স্থিরদৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে আছে। সকলে যা আশঙ্কা করছিল অতঃপর তাই ঘটলো, গলার সেই সামান্য শব্দটুকুও থেমে গেল। সকলের চোখের সুমুখেই ধীরে ধীরে একটা পিঙ্গল ছায়া মুখের উপর ছড়িয়ে পড়লো, মুখখানা একটু চুপ্‌সে

গিয়ে যেন কিছু স্বচ্ছতাপ্রাপ্ত হোলো···ঐ মুখে তখন দেখা গেল এমন একটা নতুন রকম সৌন্দর্যের আভাস যা ছেলেবেলায় হয়তো এক সময় কখনো দেখা গিয়েছিল।···

হোটেলের মালিক ঐ ঘরে এসে উপস্থিত হোলো। ডাক্তার তার কানে কানে বললে—"শেষ হ'য়ে গেছে।" শুনে সে কেবল একটু কাঁধ ঝাঁকানির ভঙ্গি করলে, অর্থাৎ এ-তো জানা কথা। ভদ্রলোকটির স্ত্রীর গাল দিয়ে অশ্রু গড়াচ্ছে, তিনি ওর কাছে গিয়ে মৃদুস্বরে বললেন—"ওঁকে এখন ওঁর থাকবার ঘরে নিয়ে যেতে বলুন।"

কৃত্রিম বিনয়ের ভঙ্গি দেখিয়ে হোটেলের মালিক একটু রুক্ষভাবেই বলে উঠলো—"সে তো হ'তে পারে না মাদাম।" এদের কাছে এখন সামান্য টাকাই পাওয়া যাবে, সুতরাং এখন আর এত খাতির কিসের ? সে বুঝিয়ে দিলে যে ঐ ঘরগুলির ভাড়া খুব বেশি, যদি ওখানে মৃতদেহ নিয়ে যাওয়া হয় তাহ'লে ভবিষ্যতে ও ঘর আর কেউ ভাড়া নেবে না, হোটেলের তাতে অনেক লোকসান হবে।

ভদ্রলোকের কন্যাটি এতক্ষণ পর্যন্ত চুপ ক'রে ওর দিকে চেয়েছিল. এইবার একটা চেয়ারে বসে প'ড়ে মুখে রুমাল গুঁজে ডুকরে কেঁদে উঠলো। ভদ্রলোকের স্ত্রীর উদ্গত অশ্রুপ্রবাহ কিন্তু ওর কথাগুলো শুনেই থেমে গেল, রাগে অপমানে তাঁর মুখটা লাল হ'য়ে উঠলো। গলা চড়িয়ে তিনি আদেশের সুরে

পুনরায় তাঁর ইচ্ছা জ্ঞাপন করলেন—আগেকার মান মর্যাদা যে এত শীঘ্রই সমস্ত লোপ পেয়েছে এটা তাঁর তখনো বিশ্বাস হচ্ছিল না। হোটেলের মালিক কিন্তু এক কথায় তাঁকে থামিয়ে দিলে। সে বললে—"অসম্ভব। মাদামের যদি এই হোটেলের ব্যবস্থা পছন্দ না হয় তাহ'লে আর তাঁর এখানে থাকাই উচিত নয়।" সে তাঁকে পরিষ্কার জানিয়ে দিলে যে আজ ভোরেই মৃতদেহ সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। পুলিশকে খবর দেওয়া হয়েছে, এখনই তারা এসে পড়বে।

মাদাম জিজ্ঞাসা করলেন—"এখানে কি কোনো রকমের শবাধার কিনতে পাওয়া যাবে?"

"না, এ সময় পাওয়া অসম্ভব। এখন অর্ডার দিয়ে তৈরি করানোও যায় না। কিন্তু যাহোক একটা ব্যবস্থা ক'রে নিতেই হবে। হাঁ, মনে পড়ে গেছে, খুব বড় বড় কাঠের বাক্স রয়েছে যাতে আমাদের সোডাওয়াটার আসে, তার থেকে বোতল রাখবার খোপগুলো খুলে নিলেই বেশ কাজ চলে যাবে।"

*　　　*　　　*

সারা হোটেল সুপ্তিমগ্ন। ৪৩ নম্বরের ঘরে বাগানের দিকের জানলাটা খোলা। বাগানের অপর প্রান্তে পাথরের পাঁচিল, তাতে কাচের ভাঙা টুকরো বসানো, তার গা ঘেঁষে উঠেছে ছিন্নপত্র একটা কলাগাছ। ঘরের ভিতর কোনো মানুষ নেই, কোনো আলো নেই, দরজায় তালা বন্ধ। অন্ধকারের মধ্যে মৃতদেহটা

পড়ে আছে। কালো আকাশে নীল তারাগুলো উজ্জ্বল হ'য়ে জ্বলছে, দূরে কোথায় একটা ঝিঁঝিঁপোকা একটানা সুরে ডেকে যাচ্ছে।···এই ঘরের বাইরের বারান্দার স্তিমিত আলোকে হোটেলের দুটি পরিচারিকা জানলার কাছে বসে কি সেলাই করছে। লুইগি ছোকরাটি একরাশ কাপড় হাতে নিয়ে সেখানে এলো।

বন্ধ দরজার দিকে ইঙ্গিত ক'রে সে ওদের জিজ্ঞাসা করলে—"সব তৈরি আছে?" এই ব'লে কপট গাম্ভীর্যের সঙ্গে সে দরজার কাছে এগিয়ে গেল, তারপর অভিনয়ের ভঙ্গিতে হাতমুখ নেড়ে চেঁচিয়ে উঠলো—"ঘণ্টা মারো, গাড়ি ছাড়লো।" যেন স্টেশন থেকে কোনো ট্রেণ ছাড়ছে। পরিচারিকারা হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়লো। লুইগি তখন আবার গম্ভীর হ'য়ে বন্ধ দরজার কাছে মুখ বাড়িয়ে সেই আগের মতো মিহি গলায় বললে—"ভিতরে আসতে পারি হুজুর?" আবার তৎক্ষণাৎ গলার স্বর বদলে ভারী আওয়াজে নিজেই তার জবাব দিলে—"হাঁ এসো।"······

৪৩ নম্বরের জানলায় যখন প্রভাতের আলো প্রথম প্রবেশ করছে, ভোরের বাতাসের প্রথম স্পর্শ পেয়ে যখন পাঁচিলের ধারের কলাগাছটির জীর্ণ পাতাগুলি থর্থর্ ক'রে কাঁপছে, ইটালীয় পর্বতশ্রেণীর অন্তরাল থেকে প্রথম সূর্যোদয়ের আভা যখন প্রভাতী আকাশের গায়ে সোনালি সিঁদুর ছড়িয়ে দিয়েছে,

ঝাড়ুদারের দল যখন শহরের পথ পরিষ্কার করতে বেরিয়েছে, তখন সেই ৪৩ নম্বরের ঘরে একটা লম্বা কাঠের বাক্স নিয়ে যাওয়া হোলো। কিছুক্ষণ পরেই সেই বাক্সটা খুব ভারী হ'য়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। একজন চাকরের জিম্মায় এই ভারী বাক্সটা নিয়ে একটা ঘোড়ার গাড়ি সমুদ্রোপকুলের দিকে রওনা হোলো। গাড়ির গাড়োয়ানের চোখ দুটি জবাফুলের মতো রাঙা, খাটো-হাতা কোট গায়ে সে চাবুক আস্ফালন করে গাড়ি হাঁকাচ্ছে। ঘোড়ার গলায় ঘুঙুর বাজছে, মাথায় পালকের গুচ্ছ চূড়ার আকারে বাঁধা, চামড়ার সাজের উপর তামার আংটাগুলো ঝক্‌ঝক্ করছে। গাড়োয়ান বেচারী মদ খেয়ে সারারাত জেগে জুয়া খেলেছে, তখনও তার নেশা ঘোচেনি। রাত্রের যথেচ্ছাচারগুলো মনে ক'রে সে এখন বিমর্ষ। গতকাল সমস্ত দিনে যা রোজগার হয়েছিল, জুয়াখেলায় তার শেষ কপর্দকটি পর্যন্ত খুইয়েছে। কিন্তু তবু আজকের প্রভাতটি তার বেশ ঝরঝরে লাগলো। সমুদ্রের বাতাস বইছে তাজা কন্‌কনে, এতে রাত্রি জাগরণের মাথাধরাও ছেড়ে যায়, মনটা স্ফূর্তিতে চাঙ্গা হ'য়ে ওঠে। আজ প্রভাতেই কোন এক সানফ্রানসিস্‌কোর ভদ্রলোকের শবাধার নিয়ে যাবার জন্যে অপ্রত্যাশিতভাবে একটা ভাড়াও জুটে গেল, মনটা তাই আরো খুশি। নেপ্‌ল্‌সগামী ষ্টীমার ছাড়বার সময় হয়েছে, ঘন ঘন তার তীব্র বাঁশি বেজে উঠলো, কাপ্রি দ্বীপের চারিদিক থেকে তার প্রতিধ্বনি হ'তে

লাগলো। দিনের আলো ফুটেছে, তীরভূমির প্রত্যেক রেখাটি প্রত্যেক পাথরটি পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, অস্পষ্ট আবছায়া কিছু আর নেই। গাড়ির ভিতর থেকে হোটেলের চাকরটি মুখ বাড়িয়ে দেখলে একখানা মোটরগাড়ি দ্রুতবেগে ওদের পাশ কাটিয়ে চলে গেল, তার সামনে বসে আছে ওদের হোটেলের সর্দার খানসামা, পিছনে ম্লানমুখে সানফ্রানসিস্‌কোর ভদ্রলোকের স্ত্রী আর কন্যা, রাত জেগে কেঁদে কেঁদে তাদের চোখ ফুলে

বিপুল জলরাশি আলোড়িত ক'রে দশ মিনিট পরেই ষ্টীমার ছেড়ে দিলে, সেই ষ্টীমারে ঐ সানফ্রানসিস্‌কো-পরিবার কাপ্রি-দ্বীপ থেকে চিরবিদায় নিয়ে চলে গেল। কাপ্রিদ্বীপে আবার নিশ্চিন্ত শান্তি ফিরে এলো।

ঐ দ্বীপে দু'হাজার বছর আগে একজন খামখেয়ালী রাজা রাজত্ব করতো, লক্ষ লক্ষ নরনারীর উপর তার একাধিপত্য ছিল। আপন প্রতাপে জ্ঞানহারা হ'য়ে সেই রাজা এমন অমানুষিক অত্যাচার করে গেছে যে দেশের লোকে এখনও তার কথা ভুলতে পারেনি। বর্তমানকালে মানুষ বহুজনে মিলে সম্মিলিত বুদ্ধি নিয়ে সেখানে রাজকার্য চালাচ্ছে, কিন্তু তবু তারা এখনও যে সকল কাণ্ড করছে তাও ঐ খামখেয়ালী রাজার মতোই অমানুষিক এবং অর্থহীন। ঐ একটিমাত্র মানুষ সেকালে একচ্ছত্র রাজা হ'য়ে যেখানে বাস করতো, সেই দুর্গম

পাহাড়ের উচ্চশিখরে তার সেই বিরাট মর্মরপ্রাসাদের ভগ্নস্তূপ দেখতে বিদেশের লোকেরা আজও দলে দলে সেখানে আসে, এবং তার অত্যাচারের কাহিনী শুনে অবাক হয়।

সেদিন অনেক বেলা পর্যন্ত হোটেলের অতিথিরা নিদ্রামগ্ন। তাদের বেড়াতে নিয়ে যাবার জন্যে অনেকগুলি টাট্টুঘোড়া হোটেলের দরজায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। ঘুম ভাঙলে পরিপূর্ণ প্রাতরাশের পর ঐ ঘোড়ার পিঠে চড়ে তারা ধীরেসুস্থে টাইবেরিও পাহাড় দেখতে যাবে, গরিব ভিখারিণীর দল লাঠি ধরে তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। সানফ্রানসিস্‌কোর সেই ভদ্রলোকটিরও আজ এদের সঙ্গে যাবার কথা ছিল। হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে মৃত্যু এসে পড়াতে সমস্ত রকমের ব্যবস্থাই লণ্ডভণ্ড হবার উপক্রম হোলো, সকলেই অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হ'য়ে রইল। ষ্টীমারে এতক্ষণে শবদেহ চালান হ'য়ে গেছে জেনে এইবার সকলে নিশ্চিন্ত হ'য়ে আরামে নিদ্রা দিচ্ছে, শহর এখনও জাগেনি, কোনো দোকান এখনও খোলেনি। বাজারে সবে কিছু মাছ-তরকারী বেচা শুরু হয়েছে, গুটিকয়েক লোক মাত্র সেখানে জুটেছে। ওর মধ্যে রয়েছে এক বুড়া জেলে, নাম তার লোরেঞ্জো; জীর্ণ বসন, বেপরোয়া উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতি, কিন্তু দীর্ঘ সুঠাম চমৎকার দেহখানি, অতি-সুন্দর তার গঠন,—এই দেহের সৌষ্ঠবের জন্য ইটালির সর্বত্রই সে পরিচিত, বহু শিল্পীর কাছে সে মূর্তি গড়বার মডেল হয়। গত রাত্রে

দুটি মস্ত চিংড়িমাছ জালে ধরেছিল, ইতিমধ্যে অল্পদামেই ঐ হোটেলের একজন চাকরের কাছে বেচে দিয়েছে, মাছ দুটি তার থলিয়ার মধ্যে এখনও নড়ছে। এখন থেকেই লোরেঞ্জোর ছুটি, লাল টুপিটা মাথার একপাশে ফেলে ঐ ছিন্নবস্ত্রে সে সন্ধ্যা পর্যন্ত নিজের খেয়ালে এদিক ওদিক চাইতে চাইতে পথে পথে ঘুরে বেড়াবে, হাতে থাকবে কড়া চুরোটের একটা পাইপ। আর তার কোনো কাজ নেই, চেহারাখানার দৌলতে সে সরকার থেকে কিছু কিছু মাসোহারা পেয়ে থাকে। এ কথা সবাই জানে, সে কেবল খায় দায় আর স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়ায়।

ঐ দিন সকালেই আক্রজি পাহাড় থেকে দুজন পথিক দুর্গম পার্বত্য পথে নিচে নেমে চলেছে, হাতে নিয়েছে পাহাড়ী বাঁশের বাঁশি। তারা দেখতে দেখতে চলেছে,—পাহাড় থেকে বহু নিচেকার সমতল পৃথিবী সূর্যকিরণে ঝলমল করছে, সমুদ্রে ঘেরা ক্ষুদ্র কাপ্রি-দ্বীপটি যেন নীল জলের মধ্যে সাঁতার দিয়ে ভেসে রয়েছে। সদ্য রৌদ্রস্নাত জল থেকে এখনও ভোরের বাষ্প উঠছে। চারিদিকেই দেখা যায় ইটালির উঁচুনিচু দিগন্তবিস্তৃত পর্বতমালা গাঢ় নীলবর্ণে অস্পষ্ট এবং অপরূপ, যেন পৃথিবীর প্রথম সূর্যোদয়ে ঐ নীল পর্বতশ্রেণী সবেমাত্র দৃষ্টিপথে জেগে উঠলো,······সে যে কী চমৎকার সৌন্দর্য, ভাষা দিয়ে তা বর্ণনা করা যায় না।···পাহাড় থেকে নামতে নামতে পথিক দুটি মধ্যপথে এসে দেখলে পথের ধারে এক বিশাল পার্বত্য-গুহা,

তার মধ্যে রয়েছে যীশুমাতা ম্যাডোনার এক শুভ্র প্রস্তরমূর্তি ; সূর্যকিরণ এসে পড়েছে তার মুখে, অপূর্ব এক শুভ্র জ্যোতিতে সেই মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে। অসীম মমতায় ভরা নিষ্পাপ আঁখি দুটি ঊর্দ্ধমুখে কোন মহাশূন্যের দিকে নিমগ্ন, বুঝি সেখানে তাঁর মৃত্যুজয়ী মহামানব সন্তানের চিরস্থায়ী আবাস। পথিক দুজন সসম্ভ্রমে সেই মূর্তির সামনে মাথার টুপি খুলে দাঁড়ালো, একত্রে দাঁড়িয়ে তারা বাঁশি বাজাতে শুরু ক'রে দিলে। সামান্য দুটি পথিকের পাহাড়ী বাঁশির মধুর সঙ্গীতধ্বনি পাহাড়ের গায়ে গায়ে লেগে পথে প্রান্তরে সর্বত্র ছড়িয়ে গেল। দিকে দিগন্তে প্রতিধ্বনিত হ'য়ে এই আনন্দের স্তবগান বেজে উঠলো কার উদ্দেশে ? ঐ নবোদিত সূর্যের উদ্দেশে···আর ঐ নবীন প্রভাতের উদ্দেশে,···আর ঐ অপাপবিদ্ধা জননীর উদ্দেশে— যিনি এই কুটিল অথচ মধুর পৃথিবীর দুর্বহ ভার বহন করতে বারে বারে দুঃখজয়ী সন্তানকে জন্ম দিয়ে পৃথিবীতে নিয়ে আসেন,···আর সেই অমর মানবের উদ্দেশে—যিনি জুডার দেশে অখ্যাত এক দরিদ্র মেষপালকের কুটীরে ঐ জননীর গর্ভে বহুকাল পূর্বে কবে একবার জন্মগ্রহণ করেছিলেন।···

সানফ্রানসিস্‌কোর ভদ্রলোকটির মৃতদেহ এখন ফিরে চলেছে পুরাতন ভূখণ্ড থেকে নূতন ভূখণ্ডে, তাঁর আপন জন্মভূমির দিকে। নানা বন্দরে ঘুরতে ঘুরতে নানা স্থানের বিদেশী মানুষদের কাছে অনেক অপমান ও লাঞ্ছনা পেয়ে অনেক

বিলম্বে অবশেষে তাকে সেই সুবিখ্যাত জাহাজেই দেশে ফিরে পাঠানো হোলো যাতে কিছুদিন আগে সে জীবিতাবস্থায় মহা সমাদরের সঙ্গে পুরাতন ভূখণ্ডের দিকে যাত্রা করেছিল। এখন তাকে লোকচক্ষুর অন্তরাল ক'রে লুকিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আলকাৎরা মাখানো একটা বাক্সের মধ্যে ভরে তাকে জাহাজের নিচেকার অন্ধকার খোলের ভিতর ফেলে রাখা হয়েছে। সেই জাহাজ আবার অতল সমুদ্রে লম্বা পাড়ি দিয়ে চলেছে। রাত্রি-কালে জাহাজখানা যখন কাপ্রি দ্বীপের দূর কিনারা দিয়ে চলে গেল তখন সেখানকার লোকেরা ক্ষণিকের জন্য দেখতে পেলে তার ক্ষীণ আলোকবিন্দুগুলি, একবার দেখা দিয়েই সেগুলো যেন সমুদ্রের অন্ধকারে কোথায় মিলিয়ে গেল। কিন্তু তখন জাহাজের প্রশস্ত হলঘরের মধ্যে উজ্জ্বল আলোতে উন্মত্ত যাত্রীদের আনন্দের নৃত্যোৎসব চলেছে, নিত্যই যেমন চলে থাকে।

সমুদ্রযাত্রার প্রথম রাত্রি, দ্বিতীয় রাত্রি, তৃতীয় রাত্রি, প্রতি রাত্রেই সমুদ্রবক্ষে এই নৃত্যোৎসব চলে। ওদিকে প্রচণ্ড তুফান জলরাশি তোলপাড় ক'রে অনবরত গর্জন করতে থাকে ; ঝড়ের দাপটে কালো ঢেউগুলো সমুদ্রগর্ভ থেকে যেন শোকার্তের অন্তরের উচ্ছ্বাসের মতো মুহুর্মুহু উত্তাল হ'য়ে ওঠে, তার মাথায় মাথায় জ্বলে রূপালি রেখার ঝিকিমিকি। ইউরোপ এবং আমেরিকা দুই মহাদেশের মাঝখানে সমুদ্র মধ্যে প্রবেশদ্বারস্বরূপ বিরাজ করছে জিব্রল্টার। সেখানকার সাঙ্কেতিক পাষাণস্তম্ভের

চূড়া থেকে দ্রুতগামী জাহাজখানা অতি ক্ষুদ্র দেখায়। দুর্যোগ রাত্রির তুহিন ঝটিকা ভেদ ক'রে জাহাজের আলোকচক্ষুগুলি ক্ষণেকের জন্য দেখা দিয়েই আবার অন্ধকারে অদৃশ্য হ'য়ে যায়। এই সঙ্কীর্ণ স্তম্ভটুকুর চেয়ে কিন্তু জাহাজখানার আয়তন অনেক বড়। এই জাহাজ বহু তলবিশিষ্ট, বহু নলবিশিষ্ট, নতুন যুগের মানুষের জন্যে নিপুনভাবে গড়া। ঝড় এসে তার প্রতি অঙ্গে হানা দিচ্ছে, ঢেউ এসে ধাক্কা মারছে, বরফ জমে জাহাজের গাত্রবর্ণ টা সাদা হ'য়ে গেছে, তবু সে চলেছে অটুট গাম্ভীর্যে, অটল গতিতে। ওর সর্বোচ্চ শিখরে নির্জন কেবিন, সেখানে কাপ্তেন বিপুল দেহ নিয়ে তন্দ্রায় নিমগ্ন, যেন অসাড় মাটির পুতুল। মাঝে মাঝে তন্দ্রা ছুটে যায়, জাহাজের বাঁশির তীব্রধ্বনি অতি ক্ষীণভাবে তার কানে বাজে। কাপ্তেনের কেবিনের অপর পাশে রয়েছে আরো এক রহস্যময় কেবিন; সেখানে অদ্ভুত রকমের শব্দ ক'রে তীব্র তড়িতের মতো নীলবর্ণ আলোকচ্ছটা ক্ষণে ক্ষণে ঝিলিক মেরে বিচ্ছুরিত হ'য়ে উঠছে, আর বিচিত্র ধাতুর মুখোশ প'রে একজন বেতার-বার্তাবহ কান পেতে শুনছে শতশত মাইল দূরবর্তী অন্যান্য জাহাজ থেকে কখন কি বার্তা আসে। "অ্যাটলাণ্টিস" জাহাজের জলতলস্থ খোলের ভিতর অবিরাম চলেছে কলকব্জার ঠোকাঠুকির শব্দ ও তীব্র বাষ্প নিঃসরণধ্বনি; সহস্র সহস্র টনের সুবৃহৎ বয়লার ও এঞ্জিনের তেলকালিমাখা লৌহগাত্র দিয়ে বিন্দু বিন্দু ঘাম গড়াচ্ছে। সেখানে যেন এক

বিরাট রন্ধনশালা পাতা হয়েছে, তার জ্বলন্ত চুল্লীতে যা পাক হচ্ছে তাই থেকে জন্মাচ্ছে জাহাজের গতিশক্তি ; সেই শক্তি পুঞ্জীভূত হ'য়ে সুদীর্ঘ লৌহনলের ভিতর দিয়ে প্রেরিত হচ্ছে জাহাজের প্রান্ত থেকে প্রান্ত পর্যন্ত। প্রান্ত থেকে প্রান্ত পর্যন্ত লম্বমান তার বিশাল লৌহদণ্ডগুলি সর্বদাই তৈলাক্ত, দৈত্যের মতো দুরন্ত বেগে সর্বদাই ঘূর্ণ্যমান, কিছুতেই ওর ঘূর্ণনের ব্যতিক্রম হয় না,—এই সব দৃশ্য দেখলে মানুষ আতঙ্কে শিউরে ওঠে। কিন্তু চালক ছাড়া অন্য মানুষ এখানে কেউ থাকে না, যাত্রীরা থাকে মধ্যভাগে। সেখানে শৌখিন আসবাবে সজ্জিত বিচিত্র কেবিন, সুচিত্র ভোজনাগার, সুদৃশ্য বিশ্রামাগার, সমস্তই আলোকে এবং আনন্দে জমজমাট। সেখানে উচ্চশ্রেণীর যাত্রীদের হাট বসেছে, তাদের হাস্যে গুঞ্জনে চারিদিক মুখর, ফুলের সুগন্ধে ভরপূর, বাদ্যসঙ্গীতে ঝংকৃত। এই রেশম-হীরা-জহরতের প্রাচুর্যে অলংকৃত যাত্রীদের ভিড়ের মধ্যে আবার এক ভাড়া-করা তরুণ দম্পতী প্রেমের অভিনয় দেখিয়ে নাচতে নাচতে মাঝে মাঝে পরস্পর আলিঙ্গনবদ্ধ হচ্ছে। পোযাকপারিপাট্যের গুণে মেয়েটিকে দেখলে মনে হয় সুন্দরী, ঘন চুলের রাশি সযত্নে কবরীবদ্ধ ; যুবকটির পাটকরা চুল, মুখে পাউডার লাগানো, পায়ে চকচকে বার্ণিশকরা জুতা, গায়ে লম্বা কোট, গলায় এমন ভাবে রঙীণ রেশমের বোড্ বাঁধা যে দেখলে মনে হয় অবিকল জোঁকের মতো। একঘেয়ে প্রেমের অভিনয় ও নাচের অভিনয়

দেখাতে দেখাতে ওদের অন্তরাত্মা যে নিদারুণ বিরক্তিতে ক্লিষ্ট হ'য়ে উঠেছে, সেই ভিতরকার কথাটি কেউ জানে না। এ কথাটিও কেউ জানে না যে জাহাজের নিচেকার খোলে গভীর অন্ধকার অন্তস্তলের মধ্যে কোন জিনিসটি গোপনে রাখা হয়েছে; আপন বিবরের মধ্যে সেই গুপ্তসামগ্রী নিয়ে জাহাজখানি ঝড়তুফান ভেদ ক'রে অন্তহীন মহাসমুদ্রে নিরন্ধ্র অন্ধকারের মধ্যে পাড়ি দিয়ে অবিরাম গতিতে যাত্রাপথে অগ্রসর হ'য়ে চলেছে।

ভ্রাতৃকুল

কলম্বো শহরের উপকণ্ঠ থেকে যে রাস্তাটি বেরিয়েছে সেটি বরাবর সমুদ্রের ধার দিয়ে বহুদূর অগ্রসর হ'য়ে একটি নারিকেল কুঞ্জের মধ্যে চলে গেছে। সেখানে ঢুকলে দেখা যায় ঘন-সন্নিবিষ্ট গাছের মাথায় পাতার ঝালর, তার ওপর রোদ পড়ে ভিতরে উঁকি মারছে,—আর নীচে সেই ঝিলিমিলি আলো-ছায়ার মধ্যে দরিদ্র সিংহলীদের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কয়েকখানি কুঁড়েঘর। প্রতি ঘরের আশে পাশে অনেক কলাগাছ, সবুজ কলাপাতার ঝোপে ঘরগুলি প্রায় আচ্ছন্ন। নারিকেল গাছের পাশে কলাগাছগুলিকে মনে হয় অনেক ছোট। লম্বা লম্বা নারিকেল গাছ সারি সারি সম্বদ্ধ হ'য়ে নানারকমের ভঙ্গিতে হেলে দাঁড়িয়ে আছে। গাছের সারির ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে সমুদ্রের বিস্তীর্ণ বেলাভূমি, তার অন্তরালে সমুদ্রের স্থির জল রৌদ্রকিরণে সোনার আয়নার মতো চক্‌চক্ করছে। জলে ভাসছে কয়েকটি সালতি ডিঙি, দেখতে যেন লম্বা চুরুটের মতো, —শালগাছের গুঁড়ি দিয়ে তৈরী; ডিঙিগুলিতে জীর্ণ মলিন

পাল দেওয়া, গাছের ধূলামলিন রংএর সঙ্গে তার রং একেবারে মিলে যায়।

বালুচরে গিয়ে উপস্থিত হ'লেই চোখে পড়ে এক স্বর্গীয় দৃশ্য; কালো কালো উলঙ্গ ছেলেরা কয়েকজনে মিলে দল বেঁধে সেখানে খেলা করছে, একদল ছেলে জলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে আনন্দে সাঁতার দিচ্ছে আর চারিদিকে জল উৎক্ষিপ্ত করতে করতে প্রচুর কোলাহল করছে···ওদের দেখলে মনে হয় এই সব আদি প্রকৃতির বন্য শিশু, লঙ্কা-দ্বীপের অধিবাসী আদি-মানবের এই সব সাক্ষাৎ বংশধর,—(শোনা যায় আমাদেরও আদি পিতৃপুরুষ প্রথমে নাকি এখানেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন) মনে হয় এ যুগের শহর বা বর্তমান সভ্যতা বা টাকাকড়ির সম্পদে এদের কি প্রয়োজন হ'তে পারে? এই সব বনস্পতি, এই সমুদ্র, ঐ সূর্য স্বচ্ছন্দে যে সম্পদ দান করে তাই কি এদের পক্ষে যথেষ্ট নয়? কিন্তু তবু এরাই যখন বয়সে বড় হ'য়ে ওঠে তখন ওদের এ সম্পদে আর কুলায় না, তখন ওদের মধ্যে কেউ বা লেগে যায় ব্যবসা করতে, কেউ বা চাষবাস করে, কেউ চা-বাগানে মজুরী খাটে। আবার কতকজন চলে যায় দ্বীপের উত্তরপ্রান্তে, সেখানে গিয়ে নিগ্রোদের সঙ্গে মিশে ডুবুরির কাজ করে,—মুক্তার খোঁজে সমদ্রের তলা পর্যন্ত নেমে চলে যায় আর অনেক পরে উঠে আসে চোখ রক্তবর্ণ ক'রে। ওদের মধ্যে আর একদল মানুষ আছে যারা ঘোড়ার

মতো কাজ করে,—অর্থাৎ তারা ইউরোপীয় আরোহীদের রিক্‌শ-গাড়ীতে টেনে টেনে শহরের চারদিকে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায় এখানকার লাল কাঁকরের পথ দিয়ে আর বড় বড় গাছের পাতায় ঢাকা ছায়াবীথির মধ্য দিয়ে। ঘোড়াগুলো এখানকার গরম সহ্য করতে পারে না, এমন কি অষ্ট্রেলিয়ার ওয়েলার ঘোড়া পর্যন্ত নয়; যে সব ধনী লোকেরা শখ ক'রে ঘোড়া রাখে তাদের প্রতিবৎসর গরমের সময় ঘোড়াগুলোকে পাহাড়ে পাঠিয়ে দিতে হয়।

প্রত্যেক রিক্‌শওয়ালার বাম বাহুতে ইংরেজ রাজসরকার এক একটা তক্‌মা এঁটে দিয়েছে, তাতে রয়েছে নম্বর দেওয়া। ঐই নম্বর আবার দু'রকমের—কতকগুলো সাধারণ নম্বর, আর কতকগুলো বিশিষ্ট নম্বর। এক বৃদ্ধ রিক্‌শওয়ালা শহরের কাছাকাছি ঐ নারিকেল বনের মধ্যে এক কুঁড়েঘরে বাস করে,—তার ভাগ্যে একটা বিশিষ্ট নম্বর জুটে গেছে,—সাত। ভগবান বুদ্ধ একালে উপস্থিত থাকলে হয়তো প্রশ্ন করতেন—"হে ভিক্ষুগণ, এই বৃদ্ধ কিসের কামনায় দুঃখের এত বোঝা বহন করে?" ভিক্ষুরা তার উত্তরে বলতো—"হে প্রভু, প্রেমের মোহের যে আকর্ষণে আবহমানকাল থেকে ধরাতলে জীবনের সৃষ্টি হচ্ছে, অন্যান্য সকলের মতো ওকেও সেই একই মোহের টানে টেনেছে, সেইজন্যই এই বৃদ্ধ স্বেচ্ছায় দুঃখের এত বোঝা বহন করছে।" বৃদ্ধের সংসারে আছে এক স্ত্রী, এক জোয়ান

ছেলে, আর কতকগুলি বাচ্চাকাচ্চা,—এতগুলিকে যে প্রতিপালন করতে হবে সেজন্য কোনো দুশ্চিন্তা তার নেই। লোকটার গায়ের বর্ণ খুব কালো, আর দেখতে এমন রোগা এবং বেঁটে যে তাকে স্ত্রীলোকের সমানও বলা যেতে পারে, বালকের সমানও বলা যেতে পারে। লম্বা লম্বা তৈলাক্ত চুল ঘাড়ের কাছে ঝুঁটি করে বাঁধা, তাতে রীতিমত পাক ধরেছে; এদিকে হাড়ের উপর চামড়াখানি কেবল লেগে আছে মাত্র, তাও অত্যন্ত লোল হ'য়ে গেছে। সে যখন ছুটতে থাকে তখন তার নাক বেয়ে গাল বেয়ে কোমরের কৌপীন বেয়ে টস্ টস্ করে ঘাম ঝরতে থাকে; ছুটতে ছুটতে সে খুব হাঁপায় আর তার জীর্ণ বক্ষ-পঞ্জরের ভিতর থেকে তখন বাঁশীর মতো আওয়াজ শোনা যায়। শ্রান্ত হ'লেই একটা পান মুখে দিয়ে সে আবার চাঙ্গা হ'য়ে ওঠে, তখন সে আবার দ্রুতবেগে ছুটতে থাকে; আরোহী তার গাড়ীতে বসে রৌদ্রদগ্ধ শহরের লাল পাথর-বাঁধানো রাস্তার উপর দিয়ে আর দুধারে ছড়ানো ঝরাফুলের সৌরভের মধ্য দিয়ে আরামে যাতায়াত করে।

নিজের সুখের জন্য ঐ রিকশওয়ালা এত পরিশ্রম করে না। কিন্তু যে সুখ তার নিজের ভাগ্যে হয়নি সেই সুখ যাতে তার প্রিয়জনে পায়, যাতে তার ছেলে সুখী হয়, এই জন্যই সে এত কষ্ট সহ্য করে। ইংরেজী কথা ভাল বুঝতে পারে না, আন্দাজে কোনমতে আরোহীর ঠিকানা বুঝে নিয়ে সে তৎক্ষণাৎ

দৌড়ে চলে। গাড়ীখানা খুব ছোট; মাথার উপর একটা আচ্ছাদন আছে সেটা দরকার হ'লে মুড়ে ফেলা যায়; চাকা-গুলো সরু সরু, গাড়ীর কম্পাস দুটোও খুব সরু, কতকটা যেন লাঠির মতো। কোনোদিন হয়তো একজন বিপুলকায় বিলাতী সওয়ারী জোটে, চোখগুলো কটা কটা, পোঁষাক একেবারে ধব্‌ধবে সাদা, মাথায় সাদা সোলার টুপি, পায়ে মোটা চামড়ার দামী জুতো,—সে গম্ভীরভাবে গাড়ীতে উঠে বসে, কোনমতে শরীরটা গদির আসনের মধ্যে ঢুকিয়ে পায়ের উপর পা তুলে দেয়, তারপর ভারী গলায় তার গন্তব্যস্থানের নাম আভাষে একটু বলে মাত্র। অমনি বৃদ্ধ কম্পাস দুটো আঁক্‌ড়ে ধরে সামনের দিকে ঝুঁকে প'ড়ে তীরবেগে ছুটে চলে, মাটিতে পা তখন ঠেকে কি না ঠেকে। টুপিওয়ালা সওয়ারীর হাতে থাকে একটা চাবুক, তার এক প্রান্তে খানিকটা শণের মতো পুচ্ছ দেওয়া। লোকটি হয়তো অন্যমনস্ক হ'য়ে যেতে যেতে একবার হটাৎ চোখ পাকিয়ে বিষম রেগে উঠে পথের দিকে চেয়ে দেখে—ব্যাটা তো ভুল পথ দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে! অমনি পিঠে পড়ে চাবুক। এমনি ক'রে কত চাবুক যে পিঠে পড়েছে তার কি ঠিক আছে! পিঠের ডানার হাড় দুখানা তাই চাবুকের আঘাতের প্রতীক্ষায় সর্বদা কোঙা হয়েই থাকে। কিন্তু ভাড়া নেবার সময় বিলাতী সাহেবের কাছ থেকে ন্যায্য পাওনার চেয়ে কিছু বেশি আদায় না ক'রেও সে ছাড়ে না। পুরা দমে

দৌড়তে দৌড়তে কোনো হোটেল বা অফিসের দরজায় পৌঁছে থামতে বললেই সে হঠাৎ একেবারে থেমে যায়, তারপর কম্পাস মাটিতে নামিয়ে এমনভাবে মুখ কাঁচুমাঁচু করে, ঘর্মাক্ত হাত দুখানি পেতে এমনভাবে দাঁড়ায় যে পাওনার বেশি কিছু পয়সা তাকে না দেওয়া তখন অসম্ভব।

একদিন দুপুরবেলার ভরা রোদে নিতান্ত অসময়ে সে বাড়ী ফিরে গেল। তখন চড়াই পাখীর দল সেখানে ভারী ব্যস্ত হ'য়ে লাফালাফি করছে, ঝাঁকে ঝাঁকে টিয়া পাখীরা কলধ্বনি করতে করতে আলো-ছায়ার ঝোপের ভিতর থেকে বেরিয়ে তীরের মতো গাছে গাছে উড়ে যাচ্ছে; বহুরূপী রঙীন্ গিরগিটিগুলো গলা ফুলিয়ে নারিকেলগাছ বেয়ে সর্ সর্ ক'রে উপরে উঠছে, রং-বেরঙের প্রজাপতি বাতাসে ভর দিয়ে অলস-গতিতে আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে—তাদের ডানা একটুও নড়ছে না; এক একটা মাটির ঢিবির গায়ে অসংখ্য পিঁপড়ের দল দীর্ঘ সার বেঁধে মন্থর গতিতে চলেছে। এমনিভাবে একদিক থেকে যখন বনের মধ্যে জন্ম-মৃত্যু-বিধাতার অস্ফুট জয়গান উঠছে আর অন্যদিকে খাদ্যখাদক সম্পর্কের জীবেরা পরস্পরকে ধ্বংস করতে ক্ষণিক উল্লাসে উন্মত্ত হচ্ছে,—এমন সময় কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে তাড়াতাড়ি ঐ বৃদ্ধ রিক্‌শওয়ালা নিজের ঘরে ফিরে গেল। তখন তার এমন অবস্থা যে কিছুই সে চায় না, কেবল কষ্ট থেকে একটু মুক্তি পেতে চায়; অন্ধকার মেটেঘরের এক কোণে

গিয়ে সে একেবারে বেহুঁস হ'য়ে শুয়ে পড়ল আর কলেরায় হাত-পা খেঁচে সন্ধ্যার মধ্যেই মারা গেল। সূর্য যখন সমুদ্রের পশ্চিম দিগন্তে লালে-ধূসরে-সোনালিতে মেশানো অপূর্ব বর্ণ-বিন্যাস রচনা ক'রে অস্ত যাচ্ছে, সেই সময় তারও জীবন-প্রদীপ নিবলো। রাত্রিকাল এলো,—সেই রাত্রে সেই নগর-প্রান্তে বনের ভিতর রিক্‌শওয়ালার অস্তিত্বের মধ্যে অবশিষ্ট রইল তার শবদেহটি, তখন আর তার নামও নেই নম্বরও নেই; নদীটি যখন সমুদ্রে এসে পড়ে তখন যেমন তার পরিচয় হারিয়ে যায় এও যেন ঠিক তাই। সূর্য যখন ডুবে যায় তখন সমুদ্রে তবু একটা বাতাসের চাঞ্চল্য জাগে; মানুষ যখন চলে যায় তখন কি কোথাও কিছু তার চিহ্ন জাগে ?…

রাত্রি আসার সঙ্গে সঙ্গে রূপকথার পরীর দেশের মতো গোধূলির সেই ধূসর-ছাওয়া কোমল গোলাপী আভা ধীরে ধীরে মুছে গেল, বাদুড়গুলো গাছতলা দিয়ে নিঃশব্দে উড়ে গিয়ে আপন আপন রাত্রির আশ্রয় খুঁজে নিলে, বনের ভিতর জমাট অন্ধকারের মধ্যে অসংখ্য জোনাকির আলো জ্বলে উঠলো। ঝিঁঝিঁপোকার ডাকে আর পাতার মর্মরে তখন একটা রহস্যের আভাস জেগে উঠলো।

দূরের মন্দিরে মিট্‌মিট্‌ ক'রে সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বলছে, ভিতরকার বেদীতলে নৈবেদ্যের চাল আর ঝরা ফুলের পাপড়ি ইতস্তত ছড়ানো, কালো পাথরের বেদীর উপর চন্দনকাষ্ঠে গড়া ভগবান

বুদ্ধের অর্ধ-শয়ন বিরাট মূর্তি। মূর্তি দক্ষিণ পাশে হেলে শুয়ে আছে, একটি হাত চিবুকে লগ্ন, প্রশস্ত মুখখানিতে সোনালি রঙ্ মাখানো, চোখ দুটি টানা টানা, ওষ্ঠে একটি বিষাদ-ম্লান স্মিত হাসির স্নিগ্ধ রেখা।

অন্ধকার কুঠুরীতে রিক্শওয়ালার শব-দেহ চিৎ হ'য়ে পড়ে রইল। বীভৎস মুখে মৃত্যুকাতরতার শেষ অভিব্যক্তি। ভগবান বুদ্ধের উচ্চারিত সংসার-মায়া-ত্যাগের উপদেশবাণী তার কানে কখনো পৌঁছয়নি, এ জন্মে সে যত পাপ সঞ্চয় করলে, পরজন্মে হয়তো সেজন্য তাকে আরও অনেক দুঃখ ভোগ করতে হবে। তার বিকৃতদশনা বৃদ্ধা স্ত্রী দরজার একপাশে উনুনের ধারে বসে গুমরে গুমরে সমস্ত রাত কাঁদতে লাগলো, অবোধ মায়া আর মোহ তাকে শোকে উদ্বেল ক'রে তুললে। ভগবান বুদ্ধ এস্থলে হয়তো ওর শোকের তুলনা দিতেন ওরই কানে-পরা তাম্রকুণ্ডলের সঙ্গে—যার গুরুভারে ওর কানের পাতা একেবারে ঝুলে পড়েছে, আর যেটা ছিল তার ছিদ্র সেটা এখন প্রকাণ্ড গহ্বরের মতো বিসদৃশ দেখাচ্ছে। অন্ধকারে সবই আবছা দেখায়, তার কালো দেহে আঁটা সাদা কাপড়ের কাঁচুলিটাই কেবল সুস্পষ্ট দেখা যায়। অনতিদূরে ওর উলঙ্গ ছেলেমেয়েগুলো চীৎকার ক'রে ছুটোপাটি করছে। বড় ছেলেটি এখন তরুণ যুবা, সে উনুনের ধারে এক পাশে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। সেইদিন সন্ধ্যাবেলা সে গিয়েছিল পাশের

গাঁয়ে তার প্রণয়িণীর কাছে,—মেয়েটির বয়স মাত্র তেরো বছর, মুখখানি বেশ গোল। ফিরে এসে বাপের মৃত্যুর খবর পেয়ে প্রথমটা সে হতভম্ভ হয়ে গিয়েছিল, হঠাৎ যে এমন হবে তা কল্পনাও করেনি। কিন্তু ওর মনে যে নবীন প্রেম সদ্য ফুটে উঠেছে, বোধ হয় পুরানো পিতৃ-প্রেমের চেয়েও তাই এখন ওর কাছে বেশি বলবান। তথাগত বুদ্ধ এই প্রেম সম্বন্ধে একজনকে বলেছিলেন,—'হে যুবক, অগ্নির স্পর্শ দিয়ে যেমন অগ্নি জ্বালা হয় তেমনি তোমার প্রাণের স্পর্শ দিয়ে তুমি অপরের প্রাণের দীপ প্রজ্বলিত করতে চলেছ ; কিন্তু একথা যেন ভুলোনা যে এই হন্তারক পৃথিবীতে যত দুঃখ শোক কেবল এই প্রেম থেকেই আসে।" কিন্তু বিছা যেমন করে তার বিবরে ঢুকে যায় তেমনি ক'রে প্রেম ইতিমধ্যে এই যুবার হৃদয়-কন্দরে সম্পূর্ণরূপে ঢুকে গেছে। উনুনের আগুনের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে সে একভাবে দাঁড়িয়ে রইল। যুবকের পা দুখানি খুব লম্বা, কিন্তু তার চিকণ কালো দেহের যে সুঠাম গঠন স্বয়ং শিবও যেন তার কাছে লজ্জা পান। কালো চুলগুলি রয়েছে মাথার উপর চূড়া করে বাঁধা, আগুনের আভা তার মুখের উপর এসে পড়েছে, চোখ দুটো জ্বলছে যেন হাপরের মুখে আগুনের ভাঁটার মতো।

পরদিন প্রতিবেশীরা বৃদ্ধের মৃতদেহটা গভীর বনের ভিতর নিয়ে গেল, সেখানে মাটিতে গহ্বর কেটে পশ্চিম দিকে মাথা ক'রে তার মধ্যে তাকে শুইয়ে দিলে, তার উপর পাতা আর

মাটি চাপা দিয়ে এসে স্নান ক'রে শুদ্ধ হোলো। বৃদ্ধের ছুটাছুটি সাঙ্গ হোলো, আর রিক্‌শ গাড়ির তক্‌মাটি উত্তরাধিকার-সূত্রে পেলে তার বড়ো ছেলে, নিজের হাতে সেটিকে সে পরম সম্ভ্রমের সঙ্গে বেঁধে নিলে।

প্রথম কিছুদিন সে তার পর থেকে যত অভিজ্ঞ রিক্‌শ-ওয়ালাদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে লাগলো, তারা সওয়ারী নিয়ে কোথায় কোথায় ঘোরে সেটা দেখলে, ইংরেজী কোন্ কথার কি মানে বোঝায় তা মুখস্থ ক'রে নিলে, কোন রাস্তার কি নাম তাও মুখস্থ করে নিলে; তারপর নিজেই রিক্‌শ নিয়ে রোজগার আরম্ভ ক'রে দিলে। তার এখন প্রণয়ের পাত্রী জুটেছে, সে এখন নিজের মনের মতো একটি সংসার পাত্‌তে চায়। এই এক বাসনা থেকেই যথাক্রমে পুত্রকন্যার বাসনা আসে, তার থেকে আসে সম্পদের আকাঙ্ক্ষা, তার থেকে যত ঐহিক সুখের অভিলাষ।

কিন্তু একদিন ভাড়া খেটে বাড়ী ফিরে সে আবার এক নতুন দুঃসংবাদ শুনলে; তার ভাবী বধূটি কোথায় হারিয়ে গেছে। ঘর থেকে বেরিয়ে দাস-উপদ্বীপের বাজারে গিয়েছিল কি যেন কিনতে, তারপর থেকে আর তাকে পাওয়া যাচ্ছে না। সেই বাক্‌দত্তা মেয়েটির বাপ কলম্বো শহরের পথ ঘাট সমস্তই চেনে, প্রায়ই সে শহরে যাতায়াত ক'রে থাকে; সে তিনদিন ধরে মেয়েকে খুঁজে বেড়ালো, তারপর যেন নিশ্চিন্ত হ'য়ে ফিরে

এলো। তার ভাব দেখে বোধ হোলো নিশ্চয় কিছু সন্ধান সে পেয়েছে, কিন্তু প্রকৃত কথাটা যেন চেপে গেল, কেবল একটু দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে দু'ফোঁটা চোখের জল ফেললে, অদৃষ্টকে ধিক্কার দিলে। লোকটা অতি শঠ; শহরে গিয়ে ব্যবসা ক'রে যাদের অনেক পয়সা জমে তারা যেমন চতুর হয়, এ বৃদ্ধকে দেখলেও মনে হয় তাই। দেহটা বেজায় মাংসল, বুকের মাংস স্ত্রীলোকের স্তনের মতো দোলে, পাকা চুলে পাট ক'রে সিঁথি কাটা, তাতে দামী একটা চিরুনি রয়েছে গোঁজা; খালি পায়ে চলে কিন্তু মাথায় থাকে ছাতা; রঙীন কাপড়ের লুঙ্গি পরে, হাঁসিয়া দেওয়া শৌখিন জামা গায়ে দেয়। তার কাছে ভিতরের কথা বের করা বড় কঠিন। উড়ো উড়ো ভাবের অনেক কথার পর বললে স্ত্রীলোক মাত্রেই তো চঞ্চলমতি, বিশেষ যদি অবিবাহিত হয়, এ আর নতুন কথা কি? নদী যেমন ক্রমাগতই এঁকে-বেঁকে চলে, সেইরকম হয় এইসব মেয়েদের চরিত্র।

রিক্‌শওয়ালা যুবক সব কথাই বুঝতে পারলে। শোকের ঘোরে তবু সে প্রথম দুদিন ঘরে চুপ ক'রে বসে রইল, এমন কি অন্নস্পর্শ পর্যন্ত করলে না; তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে আবার শহরে গাড়ী টানতে বেরিয়ে গেল। তখন দেখা গেল যেন তার ভাবী বধূর কথা সে একেবারেই ভুলে গেছে। রিক্‌শ নিয়ে আবার পূর্বের মতো খুব ছুটতে লাগলো, কৃপণের মতো

পয়সাও বাঁচাতে লাগলো,—দেখে বোঝবার উপায় নেই, সে ছুটতে বেশি ভালবাসে না পয়সাই তার অধিক প্রিয়। একজন রাশিয়ান নাবিক একদিন তার রিকৃশতে বসে একটা ফোটো তোলালে, সেই ছবি একখানা তাকে উপহারও দিয়ে গেল। অনেকদিন পর্যন্ত সেটা দেখে দেখে কিছুতে তার আশ মিটতো না, নিজের প্রতিকৃতি ছবিতে আঁকা রয়েছে দেখে ভারী খুশি হোতো ; গাড়ীর কম্পাস দুটি ধরে দাঁড়িয়ে যেন সে কাল্পনিক দর্শকদের দিকে চেয়ে আছে,—ছবিখানা যেই দেখে সেই তাকে তৎক্ষণাৎ চিনতে পারে, এমন কি তার হাতের তক্‌মাটা পর্যন্ত পরিষ্কার উঠেছে। এমনিভাবে অন্তত আপাতদৃষ্টিতে বেশ সুখে-সৌভাগ্যে তার ছয়মাস প্রায় কেটে গেল।

দাস-উপদ্বীপ থেকে ভিক্টোরিয়া পার্ক পর্যন্ত যে প্রশস্ত রাস্তা চলে গেছে তার একস্থানে এক প্রকাণ্ড অশথ গাছের তলায় সে একদিন অন্যান্য রিকৃশওয়ালাদের সঙ্গে বসে আছে। সকালবেলা অল্পক্ষণ আগে সূর্য উঠেছে, অশথ গাছটা খুব উঁচু বলে তার গুঁড়ির কাছে তখনো ছায়া পড়েনি। কতকগুলো শুক্‌নো পাতা সেখানে ছড়ানো পড়ে আছে ; গাড়ীগুলো এর মধ্যেই তেতে গরম হ'য়ে উঠেছে, মাটি থেকে যেন একটা মাটি-পোড়া গন্ধ উঠছে। পাকা কলার একটা সুমিষ্ট গন্ধও বাতাসে ছুটেছে, রিকৃশওয়ালারা সেখানে বসে পাকা কলা খাচ্ছে। কলার গা থেকে সোনালি রঙের নরম খোসাগুলি একটি একটি ক'রে

তারা ছাড়িয়ে ফেলছে আর ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়ছে কচি ছেলের বাহুর মতো নিটোল শাঁস। উবু হয়ে হাঁটু মুড়ে তারা মাটিতে বসেছে, মাথায় স্ত্রীলোকের মতো ঝুঁটি বাঁধা, কলা খেতে খেতে পরস্পরে আপন মনে গল্প করছে। হঠাৎ দেখা গেল অনেক দূরের একটা সাদা বাংলোর ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো সাদা পোষাক পরা একটি লোক, আলোছায়ার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে লাগলো তাদেরই দিকে। লোকটি রাস্তার মাঝ দিয়ে হাঁটছে, পদক্ষেপ দেখলেই বেশ চেনা যায়,—ইউরোপীয় ছাড়া আর কেউ এমন দৃপ্ত ভঙ্গীতে হাঁটবে না। যত রিক্‌শ-ওয়ালা ছিল সকলে একসঙ্গে লাফিয়ে উঠে তীরবেগে তার দিকে ছুটলো, সকলেই চায় আগে গিয়ে তাকে অধিকার করে নিতে। দৌড়ে গিয়ে তারা চারিদিক থেকে তাকে ঘিরে ফেললে, লোকটি বেত উঁচিয়ে এক ধমকে তাদের আগ্রহ থামিয়ে দিলে। ভয়ে তারা যখন একেবারে চুপ করে দাঁড়িয়ে গেল, তখন তাদের চেহারা দেখে তার মধ্যে বেছে বেছে ঐ সাত নম্বরের কালো রিক্‌শওয়ালাটিকে সকলের চেয়ে জোয়ান মনে হোলো; ওকেই তখন সে পছন্দ করে নিয়ে ওর গাড়িতে গিয়ে উঠে বসলো।

আরোহী লোকটি বেশ হৃষ্ট-পুষ্ট তবে লম্বায় কিছু বেঁটে, চোখে সোনার চশমা, কালো ভ্রূদুটি জোড়া, গোঁফ ছোট করে ছাঁটা, গায়ের রং ঝল্‌সানো লাল; এদেশের প্রখর রোদে আর

লিভারের দোষে মুখখানা যেন তাঁবাটে হয়ে গেছে। মাথায় শোলার টুপিটার খাকী রং। কালো ভ্রূ আর কালো পল্লবের ঝোপের ভিতর থেকে চোখ দুটি চশমার পুরু কাচের মধ্য দিয়ে এমন অদ্ভুতভাবে চাইতে থাকে, যেন চেয়ে আছে তবু কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। রিক্‌শতে চড়েই অভ্যস্তের মতো সে এমন ভাবে হেলান দিয়ে বসল যাতে রিক্‌শওয়ালার টানতে সুবিধা হয়; কব্জিতে চামড়ার ব্যাণ্ড দিয়ে বাঁধা ছোট ঘড়িটার দিকে চেয়ে সময়টা একবার দেখে নিলে—হাতখানি বেশ বলিষ্ঠ, তাতে রয়েছে উল্কি আঁকা—তারপর হুকুম দিয়ে বললে "ইয়র্ক ষ্ট্রীট"। গলার স্বর শান্ত গুরুগম্ভীর, কিন্তু চোখে সেই একই রকম অদ্ভুত দৃষ্টি। রিক্‌শওয়ালা কম্পাস ধরেই প্রাণপণে ছুটলো। কম্পাসের প্রান্তে বাঁধা ঘণ্টাটি অনবরত ঠুন্ ঠুন্ করে বাজাতে বাজাতে রাস্তার লোকের ভিড়ের মধ্য দিয়ে দুধারে অসংখ্য গরুর গাড়ী আর রিক্‌শগাড়ীর মধ্য দিয়ে এঁকে-বেঁকে পাশ কাটিয়ে পথ করে সে ছুটে যেতে লাগলো।

তখন মার্চ মাস শেষ হ'য়ে গেছে। এই সময়টাই ওখানে সকলের চেয়ে গরম। সূর্য উঠেছে এখনও তিন ঘণ্টা হয়নি, এর মধ্যেই রৌদ্রের তেজ এমন প্রখর,—আর বাজারে এত লোক জমেছে, যে মনে হয় প্রায় ভরা দুপুর। পথের দুধারে সারি সারি বাংলো-বাড়ী, বড় বড় গাছের অনেক ডালপালা বাংলো-গুলির ছাদের উপর নুয়ে পড়েছে, কত বাড়ীর ঢালু ছাদের

উপর ঝরা ফুল আর শুক্‌নো পাতা বিছিয়ে রয়েছে। চারিদিককার গাছ থেকে বাগান থেকে মাটি থেকে অনবরত যেন তপ্ত নিঃশ্বাস উঠে আকাশ বাতাস ভারী ক'রে তুলেছে। মাঝে মাঝে কালো টালির ছাউনি দেওয়া সারি সারি দোকান-ঘর, ভিতরে দেখা যায় দেয়ালের গায়ে বড় বড় কলার কাঁদি ঝুলছে, কত রকম সমুদ্রের মাছ শুকিয়ে টাঙানো আছে, সেখানে যত দেশীয় খরিদ্দারের ভিড়। রিক্‌শওয়ালা ঝুঁকে পড়ে বেদম ছুটছে, এখনও শরীরে তার ঘাম দেখা দেয়নি,—তেল মাখানো কালো কুচ্‌কুচে পিঠের চামড়াটা চক্‌চক্ করছে, মাংসল কাঁধের উপর শীর্ণ গ্রীবাটি তার দ্রুতগতির ছন্দে সুঠাম ভঙ্গীতে নেচে নেচে উঠছে, মাথার তৈলাক্ত কালো চুলে রোদের আলো ঝিক্‌মিক্ করছে। রাস্তাটা যেখানে মোড় নিয়েছে সেখানে পৌঁছে সে হঠাৎ একবার থম্‌কে দাঁড়ালো, ঘাড় ফিরিয়ে নিজের ভাষায় অস্ফুটস্বরে কি একটা কথা বললে, আরোহী ইংরেজ ভদ্রলোকটি তার মধ্যে একটি কথা মাত্র বুঝতে পারলে—'পান'। কী আশ্চর্য! এমন জোয়ান ছোকরা এইটুকু পথ চলেই থেমে দাঁড়িয়ে পান খেতে চায়! প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয় ভেবে হাতের বেত দিয়ে সে রিক্‌শওয়ালার পিঠে আঘাত করলে। কিন্তু সিংহলী ভীরু হ'লেও সময় সময় বড় একগুঁয়ে হয়, সে বেতের আঘাত গ্রাহ্যমাত্র না ক'রে ঘাড় বেঁকিয়ে একেবারে গাড়ীসমেত পথের পাশে একটা পানের দোকানে হাজির হোলো।

গাড়ী রেখে কুকুরের মতো দাঁত বের ক'রে চোখ ঘুরিয়ে সে আবার বললে—'পান'। কিন্তু ইংরেজ ভদ্রলোক ততক্ষণে অন্যমনস্ক হয়ে অন্য কথা ভাবছে। এক মিনিট পরেই হাতে একটি পান নিয়ে রিক্‌শওয়ালা দোকান থেকে বেরিয়ে এলো, তাতে একটু চূণ লাগালে, এক কুচি স্থপুরি দিয়ে সেটা মুড়ে ফেললে। ভগবান বুদ্ধ সকলকে সম্বোধন ক'রে এই উপদেশ-বাণী দিয়েছিলেন—"হত্যা কোরো না; চুরি কোরো না, মিথ্যা বোলো না, চরিত্রস্খলন কোরো না, কোনো নেশার বশীভূত হয়ো না"—কিন্তু রিক্‌শওয়ালা এত খবর কি জানে? ওর পূর্বপুরুষরা যে মন্ত্র অস্পষ্টভাবে মাত্র গ্রহণ করেছিল, ওর কাছে হয়তো এসে পৌঁছেচে শুধু তারই ক্ষীণতম একটু প্রতিধ্বনি। অনেকবার বর্ষা-উৎসবের সময় বাপের সঙ্গে সে বুদ্ধের পূজা-মন্দিরে গিয়েছে, বিস্মৃত এক দুর্বোধ্য প্রাচীন ভাষায় সেখানে মন্ত্রপাঠ শুনেছে, সকলে যখন ভগবানের জয়োচ্চারণ করেছে সেইসঙ্গে সেও তোতাপাখীর মতো তাই করেছে, সকলে যখন প্রণাম করেছে তখন সেও তাই করেছে। অনেকবার তার বাপ ঐ দারু-প্রতিমার সুমুখে হাত জোড় ক'রে তাঁর স্তুতি-মন্ত্র উচ্চারণ করেছে আর তার কষ্টার্জিত অর্থ থেকে যৎসামান্য খরচ ক'রে পূজো দিয়েছে। কিন্তু সে লক্ষ্য ক'রে দেখেছে যে এর কারণ ছিল অন্যরকম, ভক্তি অপেক্ষা ভয়টাই সেখানে বেশি,—যদি কিছু পাপ হয় এবং যদি দেবতার কাছে কিছু

শাস্তি পেতে হয় যেন সেইজন্যই এ ভয়,—যেমন লোকে ভয় করে ভূতকে, সাপকে, দুষ্টগ্রহকে, অন্ধকারকে…।

পান মুখে ভরে রিক্‌শওয়ালার স্ফূর্তি দেখা দিল, হাসিমুখে গাড়ীর কম্পাস তুলে নিয়ে আবার সে ছুটতে শুরু করলে। তখন রোদের খুব ঝাঁজ; ইংরেজ ভদ্রলোক যতবার মুখ তুলছে ততবার তার চশমার কাচ আর সোনার ফ্রেমে প্রতিফলিত রৌদ্রকিরণ ঠিক্‌রে উঠছে, রোদের তাপ লেগে তার হাত পা যেন ঝল্‌সে যাচ্ছে। পৃথিবী যেন ভিতর থেকে জ্বলন্ত আগুনের নিঃশ্বাস ছাড়ছে, মাটির উপরকার বাতাস সেই তাপে স্পষ্ট কেঁপে কেঁপে উঠছে,—ফুটন্ত আগুনের কড়ার ভিতর থেকে বাষ্পের ভাপরা উঠলে তার উপরকার বাতাস যেমন কাঁপতে থাকে। কিন্তু তবু সে ভদ্রলোক নিশ্চল হ'য়ে বসে আছে, গাড়ীর হুড্‌টাও মাথার উপর টেনে দিতে বলছে না।

কেল্লার দিকে যাবার দুটো রাস্তা আছে। একটা রাস্তা গেছে ডানদিকে মালয় প্যাগোডা পার হ'য়ে খালের বাঁধের উপর দিয়ে; আর একটি রাস্তা গেছে বাঁদিক দিয়ে সমুদ্রের ধারে ধারে। ইংরেজ ভদ্রলোক বাঁ-দিকের রাস্তা দিয়ে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু রিক্‌শওয়ালা মুখ ফিরিয়ে রাঙা ঠোঁটের এমন ভাব দেখালে যেন কথাটা বুঝতে পারেনি। সে যখন ডান-দিকের রাস্তা ধরলে, ভদ্রলোক তখন আর বাধা না দিয়ে তার ইচ্ছাতেই সায় দিলে, অন্যমনস্ক হয়ে কেবল চারদিকে চাইতে

লাগলো। খালটা পথের ডাইনে পড়ে; তার সবুজ জল টল্‌টল্‌ করছে, তাতে কেবল কচ্ছপ আর পচা পানা, অপর পারে রয়েছে এক নারিকেল-কুঞ্জ। বাঁধের উপরের রাস্তা দিয়ে নানারকম পথিক চলেছে, কেউ কেউ চলেছে ঘোড়ায় চড়ে। এখানে কয়েকজন বিশিষ্ট রকমের রিক্‌শওয়ালা দেখা যাচ্ছে, তাদের মাথায় সাদা পাগড়ি, পরণে সাদা পিরাণ সাদা পায়জামা। ঐ সব রিক্‌শতে যে ইউরোপীয় সওয়ারী দেখা যাচ্ছে তাদের মুখের চেহারা ফ্যাকাশে,—যেন অনিদ্রাকাতর; তারা পায়ের উপর পা তুলে অসাড় হ'য়ে বসেছে। একটা মোষের গাড়ী পাশ দিয়ে চলে গেল,—ঐ গাড়ীর ছইয়ের মধ্যে বসে আছে একজন বৃদ্ধ পার্শী, পরণে তার লম্বা আচকান, মাথায় জরী দেওয়া টুপি। ঢিলা পায়জামা পরা দীর্ঘদেহ এক কাবুলিওয়ালা, গায়ে তার ঢল্‌ঢলে সাদা জামা, পায়ে শুঁড়তোলা নাগরা জুতো, মাথায় প্রকাণ্ড পাগড়ি, সে নিশ্চল হ'য়ে দাঁড়িয়ে জলের দিকে চেয়ে কচ্ছপ দেখছে। সারি সারি মালবোঝাই গরুর গাড়ী মন্থর গতিতে চলেছে, লোলচর্ম দু'একটি বৃদ্ধ রোদে পুড়তে পুড়তে লাল ধূলোমাখা খালিপায়ে গাড়ীর চাকার পাশে পাশে যাচ্ছে।···কেল্লাতে প্রবেশের মুখে যখন তারা এক অতিপ্রাচীন পান্থ-পাদপের তলায় এসে পৌঁছলো তখন ইংরেজ ভদ্রলোক একটি চাএর দোকানের নাম উল্লেখ ক'রে হুকুম দিলে—"চল প্যাগোডাতে।"

গাড়ী এসে থামলো একটি ডাচ্ ফ্যাশানের অট্টালিকার ফটকের সামনে। ভদ্রলোক একবার হাতের ঘড়িটা দেখে নেমে গেল, সেখানে বসে কিছুক্ষণ চা-চুরুট খাবে। রিক্‌শওয়ালা তখন গাড়ী ঘুরিয়ে নিয়ে রাস্তার ওপাশে এক ছায়া-নিবিড় গাছের তলায় রেখে, যেখানে বাঁধানো ফুটপাথের উপর হল্‌দে আর লাল রংএর ঝরা ফুলে সমস্ত গাছতলা ছেয়ে গেছে সেইখানে ক্লান্ত হ'য়ে বসে পড়ল। উবু হ'য়ে বসে হাঁটুর উপর হাত রেখে আনমনে নানারকম দেশী-বিদেশী পথিকদের দিকে চেয়ে কোমর থেকে গামছা খুলে সে মুখ মুছলে, ঠোঁট মুছলে, বুকের ঘাম মুছে ফেললে, তারপর সেটা মাথায় জড়ালে; মাথায় গামছা জড়ালে তাকে ভাল দেখায় না, মনে হয় যেন অসুস্থ, কিন্তু সব রিক্‌শওয়ালাদের এটা দস্তুর। সেখানে এমনিভাবে বসে বসে হয়তো কত কথাই সে ভাবতে লাগলো।...বৌদ্ধ গ্রন্থে কথিত আছে আনন্দ বলেছিলেন ভগবান বুদ্ধকে—"হে প্রভু, আমাদের পরস্পরের শরীর পৃথক রকমের, কিন্তু হৃদয়টি সকলেরই এক রকমের।" ঐ রিক্‌শওয়ালা যুবক, যে কলম্বো শহরের কাছে থেকে মানুষ হয়েছে, রমণীপ্রেমের সুতীব্র বিষও যে একবার আস্বাদ করেছে,—যে-স্রোতের টানে প'ড়ে মানুষ নিত্য আগ্রহভরে সুখের পিছনে ছুটে যায় আর দুঃখ থেকে দূরে পালায় সেই জীবন-স্রোতে যে একবার ঝাঁপ দিয়েছে,—তার মনের চিন্তাধারা কেমন হবে তা আমাদের পক্ষে অনুমান করা

বিশেষ কঠিন নয়। রুদ্ররূপী বিধাতা তাকে ইতিমধ্যে তীব্র একটি আঘাত দিয়ে গেছে কিন্তু আঘাত দিয়ে সে আবার আঘাতকে ভুলিয়েও দেয়। মানুষ যেটাকে একবার আঁকড়ে ধরে, নির্মম বিধাতা তার কাছ থেকে সেটাকে যদিও ছিনিয়ে নেয়,—কিন্তু আবার নূতন একটা কিছুকে ধরবার জন্য তাকে বারে বারে প্রলুব্ধ করতে থাকে।…

চা খাওয়া সেরে ইংরেজ ভদ্রলোক কিছুক্ষণ পথের ধারে ধারে ঘুরতে লাগলো; দোকানে কত রকমারি জিনিস সাজানো রয়েছে,—কোথাও বা নানারকমের মণিমুক্তা, কোথাও আবলুশ কাঠের বুদ্ধমূর্তি বা কারুকার্যখচিত সুদৃশ্য হস্তিমূর্তি, কোথাও শৌখিন গালার কাজ-করা ঘর সাজানো আসবাবপত্র, কোথাও বা সোনালি ডোরাকাটা আসল বাঘের চামড়া,—পায়ে হেঁটে আরোহী এইসব দেখে বেড়াতে লাগলো আর রিক্‌শওয়ালা নিজের কথা ভাবতে ভাবতে এবং পরিচিত রিক্‌শওয়ালাদের সঙ্গে চোখোচোখি হ'লে তাদের আপ্যায়িত করতে করতে শূন্য গাড়ি টেনে তার পিছু পিছু যেতে লাগলো। বেলা যখন বারোটা তখন তাকে খাবার খেতে একটা টাকা বক্‌শিশ দিয়ে ইংরেজ ভদ্রলোক মস্ত এক জাহাজের অফিসে ঢুকে গেল। রিক্‌শওয়ালা কিন্তু খাবার না খেয়ে টাকা ভাঙিয়ে কতকগুলো সিগারেট কিনলে। সেই সিগারেট একটার পর একটা ধরিয়ে ক্রমাগত সে জোরে জোরে টান দিতে লাগলো

আর মেয়েদের মতো বারবার দেখতে লাগলো প্রত্যেক টানে কতখানি পুড়ছে। এই রকম ক'রে সে পাঁচটা সিগারেট একে একে শেষ করলে। তিনতলা বাড়ীটার ছায়ার তলায় বসে সে সিগারেটের ধোঁয়ার মধ্যে মশ্‌গুল হ'য়ে আছে,—এমন সময় চোখ তুলে হঠাৎ দেখতে পেলে তার আরোহী আর পাঁচজন সাহেবের সঙ্গে উপরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে একটা দূরবীন চোখে লাগিয়ে সমুদ্রের দিকে চেয়ে আছে। সেখানে একটা জাহাজ ঘাটে এসে ভিড়ছে, তার প্রকাণ্ড মাস্তুল দুটো দূর থেকে দেখা যাচ্ছে। বারান্দার সাহেবরা ঘন ঘন রুমাল আন্দোলন করতে লাগলো, আর ঐ জাহাজ থেকে তার প্রত্যুত্তরে গুরুগম্ভীর ভোঁ বেজে উঠলো, পথ-ঘাট কাঁপিয়ে শহরময় সে শব্দ সজোরে প্রতিধ্বনিত হ'য়ে উঠলো। সাত নম্বর রিক্‌শ'র আরোহী আজ সুদূর ইউরোপ থেকে যে জাহাজের আগমন প্রতীক্ষা করছিল সেই জাহাজ এসে পৌঁছেচে। কুড়ি দিনের সমুদ্র-যাত্রার পর ইংরেজ-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে ঠিক সময়ে জাহাজটা কলম্বোতে পৌঁছলো; তখনই সাহেবদের পরস্পরের মধ্যে ঠিক হ'য়ে গেল সেই রাত্রে জাহাজের অফিসের বড় সাহেবের খালধারের বাড়ীতে নবাগত বন্ধুদের নিয়ে ভোজ হবে। এই ভোজের উৎসব যে রিক্‌শওয়ালার পক্ষে কত মারাত্মক তা সে বেচারা তখন কল্পনাই করতে পারেনি।

কিন্তু ভোজ হ'তে তখনও অনেক দেরী, সন্ধ্যা পর্যন্ত যথেষ্ট

সময় আছে। সেই আরোহী ভদ্রলোক, যাকে দেখলেই মনে হয় চশমার ভিতর থেকে চাইলেও কিছুই দেখতে পাচ্ছে না—সে উপর থেকে রাস্তায় নেমে এল। সঙ্গে ছিল আরও দু'জন, তারা বিদায় নিয়ে ঘাটের দিকে চলে গেল। রিক্‌শওয়ালা আবার আরোহীকে নিয়ে ছুটলো এক হোটেলের উদ্দেশে। সেখানে বহু ভ্রমণকারী আগন্তুক ও স্থানীয় ধনীলোকেরা একটা আধা-অন্ধকার ঘরে একসঙ্গে বসে খাওয়া-দাওয়া করছে, মাথার উপর একখানা পাখা চলছে।

রিক্‌শওয়ালা আবার সেখানে ছাড়া পেয়ে ফুল-বিছানো ফুটপাথের উপর বসে পড়লো। সেখানে গাছগুলির মাথায়-মাথায় কাঁচা সবুজ রংএর কচি পাতা জড়াজড়ি ক'রে দোল খাচ্ছে, তার জালবোনা ছায়া মাটির উপর দুল্‌ছে ; সেই ছায়া-পথ দিয়ে সারে সারে চলেছে ঝুঁটিবাঁধা সিংহলীর দল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ রঙীন ছবির পোষ্টকার্ড হাতে নিয়ে ঘুরছে, সাহেব দেখলেই তাদের সুমুখে গিয়ে ধরছে। কেউ বা ঝিনুকের চিরুনি প্রভৃতির ফেরি করছে, কেউ বা নানারকমের মনোহারী পাথরের জিনিষের পসরা নিয়ে ঘুরছে। একজন একটা সজারুর গলায় দড়ি বেঁধে টেনে এনে সেটাকে বেচবার চেষ্টা করছে,—এই সাহেবদের পাড়ায় অনেকেই লাভের আশায় ঘুরতে আসে।···দূরে খানিকটা চতুষ্কোণ ঘাসের জমির মাঝখানে উঁচু মর্মরবেদীর উপর শ্বেতপাথরের এক বিরাট রমণীমূর্তি—

মাথায় মুকুট আর হাতে রাজদণ্ড নিয়ে দৃপ্তভঙ্গীতে সিংহাসনের উপর বসে আছে, রৌদ্রালোকে তার মর্মরশুভ্রতা আরো জাজ্বল্যমান হ'য়ে উঠেছে।

যে সব সাহেবের দল এইমাত্র জাহাজ থেকে পদার্পণ করেছে তারাও এসে এই হোটেলে ঢুকলো। হোটেলের দ্বার-রক্ষীরা সসম্ভ্রমে সেলাম ক'রে তাদের হাত থেকে ছড়ি ব্যাগ প্রভৃতি চেয়ে নিয়ে তাদের ভারমুক্ত করলে, একজন সুসজ্জিত ভদ্রলোক ফিট্‌ফাট্ পোষাকে বেরিয়ে এসে মাথা নীচু ক'রে মার্জিত কায়দায় তাদের অভিবাদন করতে লাগলো।···ভগবান তথাগত বলেছিলেন,—"মানুষ আসল কথাটি ভুলে নিত্য ভোগ-বিলাসে রত থাকে, ক্ষণে ক্ষণে ভোজের উৎসব করে, নিত্য নূতন আনন্দের অয়োজন করে। শুধুই পার্থিব সামগ্রীর রূপ রস গন্ধ শব্দ ও স্পর্শ সম্ভোগের দ্বারা তারা সর্বদা প্রমত্ত হ'য়ে বেড়ায়। মনোহারী সবুজ বর্ণের বিষাক্ত লতা যেমন ক'রে শালগাছকে জড়িয়ে ধরে, কামনা মানুষকে তেমনি ক'রে কতই জড়ায়।" কথিত আছে যে এই সিংহল দ্বীপে, যেখানে আদিম মানব কামনার প্রথম আস্বাদ পেয়েছিল,—এই ভূস্বর্গে নাকি ভগবান তথাগত স্বয়ং একবার পদার্পণও করেছিলেন।···

যারা হোটেলে এসে ঢুকলো তাদের সকলের মুখে ক্লান্তির চিহ্ন, সমুদ্রপীড়ায় ভুগে অসুস্থতার চিহ্ন। তাদের যেন তখন প্রায় অর্ধমৃত অবস্থা, মুখে কারো ভাল ক'রে কথা সরছে না ; তবু

তারা দৃঢ়পদে ঢুকে ভিতরে অদৃশ্য হ'য়ে গেল, হাত মুখ ধুয়ে জিরিয়ে নেবার জন্য প্রত্যেকে স্বতন্ত্র কামরায় প্রবেশ করলে। যথাসময়ে খাদ্যপানীয়ের দ্বারা পরিতৃপ্ত হ'য়ে কাফি-চুরুটের দ্বারা পুনর্জীবিত হ'য়ে তাদের মুখ আবার টক্‌টকে লাল হবে, তখন তারা রিক্‌শতে চড়ে সমুদ্রতীরে বেড়াবে, ঘুরে দেখবে যত হিন্দু-মন্দির আর বৌদ্ধ-বিহার। প্রত্যেকের অন্তরেই আছে সেই অতৃপ্ত ক্ষুধা যা মানুষকে নিত্য নূতন আগ্রহ দিয়ে বাঁচিয়ে রাখে আর নিত্য নূতন কামনা দিয়ে প্রলুব্ধ করে।

কিন্তু এই আদিম দ্বীপের বাসিন্দা ঐ রিক্‌শওয়ালাটির কি সে ক্ষুধা নেই,—তাকে কি তা আরো দ্বিগুণভাবে প্রলুব্ধ করে না? তার সুমুখ দিয়ে কত সাহেবের পাশে কত বিলাতী স্ত্রীলোক যাতায়াত করছে, তার মধ্যে অবশ্য অনেক বৃদ্ধাও আছে যারা অনেকটা তার নিজের কুটীরবাসিনী মায়ের মতোই বিকৃত-সৌন্দর্য, কিন্তু সুন্দরী যুবতীও মাঝে মাঝে দেখা যায়। তাদের মাথায় শৌখীন টুপি, পরণে শৌখীন পোষাক, তারা ওর পান-খাওয়া ঠোঁটের দিকে চেয়ে ওর মনের ভিতর কত অব্যক্ত কামনার উদ্রেক করছে। যে বধূটি তার হারিয়ে গেছে সে কি এদের চেয়ে কিছু নিকৃষ্ট ছিল? এই দেশের প্রখর সূর্যতাপে সে বেড়ে উঠেছিল, তার রং ছিল তাই কালো। নীলফুল-কাটা সাদা কাপড়ের কাঁচুলিতে তাকে আরো কালো দেখাতো, তার ঘাঘরাটাও ছিল ঐ কাপড়ের। এদের চেয়ে লম্বায় অনেক

খাটো হ'লেও দেহের গঠনে তার যথেষ্টই সৌষ্ঠব ছিল। মাথাটি ছিল গোল, কপালটি ছিল ছোট,—ভীরু চোখ দুটি শিশুর মতো অদম্য কৌতূহল নিয়ে নিত্য উজ্জ্বল হ'য়ে থাকতো। তার কটাক্ষে ছিল নারী-সুলভ প্রচ্ছন্ন লাস্য-জড়িত অপূর্ব এক কোমলতা, গলায় ছিল মুক্তোর কণ্ঠি, পায়ে রূপার মল, হাতে পৈঁছা,…হঠাৎ এক লাফ দিয়ে উঠে রিক্‌শওয়ালা পাশের গলির ভিতর ছুটে গেল। সেখানে পুরানো একতলা বাড়ীর একপাশে টালি-ছাওয়া কাঠের ঘরের মধ্যে গরীবদের জন্য সামান্য একটা মদের দোকান আছে,—রিক্‌শওয়ালা পঁচিশটা পয়সা ফেলে সেখানে দাঁড়িয়ে পূরো একগ্লাস মদ খেয়ে নিলে। একে তো এই আগুন খেয়েছে, তার উপর পান তো মুখে আছেই,—এখন থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মনটা বেশ স্ফূর্তিতেই থাকবে,—যতক্ষণ না শহর থেকে সে ফিরে যায়, আবার তাদের সেই শহরতলীর বনের মধ্যে কালো অন্ধকার ঘনিয়ে ওঠে, সেই অগণ্য গাছপালা থেকে অস্ফুট রহস্যের মতো সন্-সন্ ক'রে বাতাসের আওয়াজ উঠতে থাকে,—যতক্ষণ না ঝিঁঝিঁপোকারা চারিদিক থেকে একটানা সুরে ডাকতে শুরু করে, আর বাঁশবনের মধ্যে অগণ্য জোনাকির দল আলো নিয়ে চঞ্চল হ'য়ে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে বেড়ায়…

ইংরেজ ভদ্রলোকটি যখন চুরুট মুখে মাতাল অবস্থায় হোটেল থেকে বেরুলো, তার চোখ দুটি তখন ঢুল্-ঢুল্ করছে, মুখটা

লাল হ'য়ে ফুলে উঠেছে। বারে বারে লোকটি ঘড়িটার দিকে দেখে আর কি যেন ভাবে; বাকী সময়টা কি ক'রে কাটাবে, তাই বোধ হয় স্থির করতে না পেরে হোটেলের সুমুখে অনেকক্ষণ সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর হুকুম দিলে "পোষ্ট অফিস চলো।" সেখানে গিয়ে চিঠির বাক্সে তিনখানি পোষ্টকার্ড ফেললে। পোষ্ট অফিস থেকে চলে গেল গর্ডন বাগানে। সেখানে গিয়ে কিন্তু ভিতরে ঢুকলো না, গাড়ীতে বসেই কিছুক্ষণ মনুমেণ্ট প্রভৃতি চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলো, সেখান থেকে ফিরে রিক্শতে বসেই শহরের এদিকে ওদিকে ঘুরতে লাগলো,—ব্ল্যাক টাউন, ব্ল্যাক টাউনের বাজার, কল্যাণী নদী,...মাতাল রিক্শওয়ালা আপন খেয়ালে অনবরত তাকে চরকির মতো ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে আর মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঘর্মাক্ত হ'য়ে উঠছে। মদ আর পান খেয়ে সে তখন উত্তেজিত, অনেক ভাড়া পাবে এই আশায় উৎফুল্ল, এমন এক স্বপ্নেতে সে বিভোর যা এই অবস্থায় মানুষকে বর্তমান ভুলিয়ে মশ্গুল করে রেখে দেয়। গরমে গুমোটে অসহ্য অপরাহ্ন,—এ সময় কোনো ঘর্মাক্ত পথিক পথের ধারে দুমিনিট কোনো বেঞ্চের উপর বসলেই সেখানে ঘামের একটা গোল ছাপ লেগে যায়,—এই সুদীর্ঘ অপরাহ্নটা কোথায় বসে কাটাবে তা ঐ ভদ্রলোক বলতে পারছে না দেখে রিক্শওয়ালা তাকে ব্ল্যাক টাউনের পাড়ায় পাড়ায় কেবল ঘোরাতে লাগলো। এই সব পাড়ায়

কত রকমের লোক তার দৃষ্টিগোচর হোলো ;—নগ্নদেহ কটিবাস-পরা কত স্থানীয় সিংহলী ; কত হিন্দু আর পার্শী আর পিঙ্গল-মূর্তি মালয়বাসী ; দুর্গন্ধে ভরা কত চীনেদের দোকান ; কত খোলার ঘর, বাঁশের ছাউনি, ছোট বড় দেব-মন্দির, দেশ বিদেশের জাহাজের নানারকম লশ্‌কর আর খালাসী ; কত নেড়ামাথা বৌদ্ধ ভিক্ষু, তাদের দৃষ্টি যেন উদ্‌ভ্রান্তের মতো, হল্‌দে রঙের কাপড়ে সর্বাঙ্গ আবৃত, কেবল ডানদিকের কাঁধটি খোলা, হাতে নিয়ে চলেছে এক একখানি তালবৃন্তের পাখা। পথের ধূলা-আবর্জনার মধ্য দিয়ে এমন বেগে রিক্‌শওয়ালা গাড়ী নিয়ে ছুটতে লাগলো, যেন কেউ তাকে তাড়া করে পিছু নিয়েছে। শেষে কল্যাণী নদীর তীরে একস্থানে গিয়ে তারা পৌঁছলো। অপ্রশস্ত মন্দস্রোতা নদী, জল তার রোদে উত্তপ্ত। ঘন তালগাছের ঝোপে তার দুই তীর আচ্ছন্ন। জলের মধ্যে বহু কুমীরের বাস, নৌকা দেখলে তারা ঝোপের তলায় গিয়ে আশ্রয় নেয়। পড়ন্ত রোদে নদীর জলে সোনার রং ধরেছে, সেখানে ইতস্তত কত নৌকা ভেসে চলেছে। নৌকাগুলির উপর সামান্য খড়ের ছাউনি,—ভিতরে আছে বস্তা বস্তা চাল, চাএর পেটি, দারুচিনি, সমুদ্রতল থেকে সদ্য আহৃত নানারকমের মণি-মুক্তা, আরো কত রকম পণ্যদ্রব্যে নৌকাগুলি বোঝাই।...

ইংরেজ ভদ্রলোক বহুক্ষণ পরে হুকুম দিলে ফোর্টের দিকে ফিরে যেতে। সে অঞ্চল তখন জনশূন্য,—অফিস, আদালত,

ব্যাঙ্ক, সব তখন বন্ধ হ'য়ে গেছে। সেখানে এক নাপিতের দোকানে গিয়ে ভদ্রলোক দাড়ি কামিয়ে নিলে, তাতে যেন তার বয়স আগের চেয়ে কম দেখাতে লাগলো ; তারপর কতকগুলো চুরুট কিনে একটা ঔষধের দোকানে ঢুকলো।...অনবরত ছুটে ছুটে রিক্‌শওয়ালা তখন ঘর্মাক্ত-কলেবর, রুক্ষমূর্তি, খ্যাপা কুকুরের মতো থেকেথেকে কি-এক বিদ্বেষপূর্ণ দৃষ্টিতে আরোহীর দিকে চাইছে।...ছ'টা বেজে গেলে সে কুইন্ ষ্ট্রীট্ ধরে লাইট্ হাউস্ পার হ'য়ে চললো সেনা-নিবাসের মধ্য দিয়ে, সেখানকার নির্জন রাস্তাগুলি অতিক্রম ক'রে শেষে সমুদ্রতীরে মুক্তবায়ুতে উপস্থিত হ'য়ে যেন একটু মুক্তি বোধ করলে। তখন দিগন্ত-গামী সূর্যের কিরণ জলের উপর পড়েছে, বিস্তীর্ণ জলরাশি ইস্পাতের মতো ঝক্‌ঝক্ করছে, তার মাঝে মাঝে যেন প্রচুর সোনার গুঁড়ো ছড়ানো। এখান থেকে ফিরে গাল্‌ফেস্ প্লেস্ ধরে আবার সে দাস-উপদ্বীপের দিকে ছুটে চললো।

ভগবান তথাগত বলেছেন—"লোভ থেকেই সুখের বাসনার উদ্রেক হয়, সুখের বাসনা থেকে হয় দুঃখের উদয়, আর দুঃখ থেকে হয় ভয়ের উদয়।" এখন কিন্তু রিক্‌শওয়ালার চোখ দেখলে মনে হয় তার অন্তরে যুগপৎ দুঃখ ভয় আর হিংসার উদয় হয়েছে। ছুটে ছুটে তার মেজাজ গরম হ'য়ে উঠেছে, অনেকবার ক্লিষ্টদৃষ্টিতে কষ্টদাতার দিকে সে ফিরে ফিরে চেয়েছে, লম্বা লম্বা পা ফেলতে ফেলতে অনেকবার দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে।...

সূর্যাস্তের পর এই রাস্তাটা একেবারে ফাঁকা হ'য়ে যায়। দিনের কাজকর্ম সেরে সাহেবরা ডিনারের পূর্বে একবার এদিকে বেড়াতে আসে; কেউ বা দামী গাড়ীতে চড়ে হাওয়া খায়, কেউ আপন স্ত্রী-পুত্রদের সঙ্গে নিয়ে হাওয়া খেতে আসে; অনেকে আবার ফুটবল খেলে, টেনিস্‌ খেলে; অনেকে সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে সূর্যাস্তের বিরাট সমারোহ উপভোগ করে, এমন অপূর্ব শোভা নিজের দেশে তারা দেখতে পায় না। রিক্‌শওয়ালা সেখান দিয়ে যেতে যেতে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে দেখলে—খাটো প্যান্ট্‌ আর রঙীন জামাপরা কটা-চুল কয়েকজন লোক একটা মস্ত চামড়ার বল নিয়ে প্রাণপণে ছুটছে, ছুটন্ত বলের সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠছে, পায়ের বুট দিয়ে সশব্দে বলটার উপর লাথি মারছে। সূর্য অস্ত যাচ্ছে; উপরের আকাশ লাল হ'য়ে উঠলো, একখানা হাল্কা মেঘ আকাশের এক কোণে পড়ে ভাসছিল, ধীরে ধীরে তার সমস্তটাতেই গোলাপী রং ধরে গেল। …ইংরেজ ভদ্রলোক এতক্ষণ বিমনা হ'য়ে পশ্চিম দিকে চেয়ে সমুদ্রের তটভূমিতে ঢেউ-ভাঙা ফেনার বিচিত্র লীলা দেখছিল, এবার সন্ধ্যা হ'য়ে আসছে দেখে বললে—"কার্লটন হোটেল।"…

রিক্‌শওয়ালা দাঁতে দাঁত চেপে ছুটলো। যে লোকটা ওকে এত ছোটাচ্ছে সুবিধা পেলে তাকে এখন সে চিবিয়ে খেতে পারে, কিন্তু তবু না ছুটেও উপায় নেই; গাড়ির উপর আরোহী বিরসমুখে বসে আছে আর এক একবার ছড়ির প্রান্ত

দিয়ে রিক্‌শওয়ালার অঙ্গস্পর্শ করে তাকে আরো দ্রুতগমনের জন্যে ইঙ্গিত করছে। সে যে মানুষ-টানা রিক্‌শতে চড়েছে এ বোধ আর তার নেই, কেবল একটা অবিশ্রাম গতির নেশায় অহেতুক তার ঝোঁক লেগে গেছে। ভদ্রলোক দাস-উপদ্বীপের কাছাকাছি একটা সামান্য হোটেলে বাসা নিয়েছিল, কারণ কেল্লার কাছে কোনো ভাল হোটেলে জায়গা ছিল না,—কাজেই রিক্‌শওয়ালা আবার সেই অশথতলা পার হ'য়ে চলল। এ সেই অশথতলা, যেখানে সে আজই সকালে সুখের বৃথা আশায় এই সব দয়ামায়াহীন লোকের কাছ থেকে কিছু অর্থ উপার্জনের লোভে অপেক্ষা ক'রে বসেছিল। আবার পার হ'য়ে গেল সেই সব পাঁচিল-ঘেরা পরিচিত বাগান, সেই সব বাংলো-বাড়ী যার ঢালু ছাদের উপর গাছের ডালপালা ফুলভরে লুটিয়ে পড়েছে।... এমনি একটি বাংলোর সীমানার মধ্যে ঢুকে এবার সে আধ-ঘণ্টা বিশ্রাম পেলে, আরোহী ততক্ষণ ভিতরে পোসাক বদলাতে চলে গেল। ওর বুকের ভিতর তখন সজোরে হাতুড়ি পিট্‌ছে, ঠোঁট শুকিয়ে মুখখানা চুপ্‌সে লম্বা হ'য়ে গেছে, চমৎকার চোখ দুটি বিস্ফারিত হ'য়ে উঠেছে, মাথায় জড়ানো গামছাটা ঘামে এত ভিজে গেছে যে সেটা টান মেরে খুলে ফেলে দিতে হোলো। তার ঘর্মাক্ত দেহ থেকে একটা বিশ্রী ঝাঁজালো গন্ধ বেরুতে লাগলো,—কতকগুলো পিপ্‌ড়ে একসঙ্গে ধরে দুহাতে কচ্‌লে দিলে যেমন একটা গন্ধ বেরোয় অনেকটা সেই রকম।

ইতিমধ্যে সূর্য অস্ত গেছে। এক বৃদ্ধা ইংরেজ-মহিলা ঐ বাড়ীর বারান্দায় একটা দোলা-চেয়ারে বসে সন্ধ্যার আলো-টুকুতে মনোযোগ দিয়ে একখানা ধর্মগ্রন্থ পড়ছে। মহিলাটিকে রাস্তা থেকে দেখতে পেয়ে এক শীর্ণকায় বুড়া হিন্দুস্থানী উঠানের ভিতরে এসে ঢুকলো ; তার চেহারাটা খুব লম্বা, বাব্‌রি-কাটা পাকা চুল পিঠে লুটিয়ে পড়েছে, মাথায় একটা ছেঁড়া পাগড়ি, গায়ে ঝল্‌সানো লাল রংএর আংরাখা—তার উপর হল্‌দে ডোরা-কাটা, হাতে একটা ঢাক্‌নি-বাঁধা বাঁশের চুপড়ি। লোকটা বোবা, নিঃশব্দে বারান্দার কাছে গিয়ে সে মাথা নীচু করে কপালে হাত ঠেকিয়ে সেলাম করলে, তারপর সেইখানে বসে চুপ্‌ড়ির ডালা খুলে ফেললে। মহিলাটি তার দিকে না চেয়েই হাত নেড়ে তাকে চলে যেতে ইঙ্গিত করলেন। কিন্তু ততক্ষণে সে তার ডালা খুলে কোমর থেকে একটা বাঁশের বাঁশী বের করেছে। চুপড়ির ভিতর সাপ দেখেই রিক্‌শওয়ালা লাফিয়ে উঠে রাগে আগুন হ'য়ে ধম্‌কে তাকে তেড়ে গেল। বুড়াও সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠে তাড়াতাড়ি ডালাটা বন্ধ ক'রে সেখান থেকে ছুট দিলে। দারুণ উত্তেজনায় অনেকক্ষণ পর্যন্ত রিক্‌শ-ওয়ালার চোখ দুটো জ্বলতে লাগলো,—তখনও যেন সেই ভয়ানক সাপটা ফণা ধরে দাঁড়িয়ে আছে, মসৃণ গ্রীবা থেকে তার নীলবর্ণের আভা বেরুচ্ছে, সরু জিব্‌টা লিক্‌লিক্ করছে, জ্বলন্ত চোখ দুটো চেয়ে আছে ক্রূরদৃষ্টিতে।

অন্ধকার ঘনিয়ে এলো। আরোহী ধব্ধবে পোষাকে সেজে বেরিয়ে এলো, রিক্শওয়ালা আবার তাড়াতাড়ি গাড়ীর কম্পাস তুলে ধরলে। এবার যেখানে যেতে হবে সে জায়গার নাম শোনবামাত্র রিক্শওয়ালার বুকটা একবার কেঁপে উঠেছিল কিনা কে জানে! রাত্রের আবহাওয়া বেজায় গুমোট, বর্ষা পড়বার আগে যেমন হ'য়ে থাকে। উত্তপ্ত মাটির সোঁদা গন্ধের সঙ্গে বাগানের ফুলের মিষ্ট গন্ধ মিশে বাতাস আরো ভারী হ'য়ে উঠেছে। পথের অন্ধকার এমন প্রগাঢ় যে কেবল তার নিঃশ্বাসের শব্দ শুনে আর রিক্শর চলন্ত আলো দেখে অনুমান করে নিতে হয় যে সওয়ারী নিয়ে একটা রিক্শ চলেছে। সেই অন্ধকারে যেতে যেতে কতক্ষণ পরে দূর থেকে দেখতে পাওয়া গেল সেই খালের জল, আলোর প্রতিবিম্ব তার উপর পড়ে রেখার মতো লম্বা হ'য়ে ঝিক্ঝিক করছে। ক্রমে এজেন্টের মস্ত দোতালা বাড়ীটা দেখতে পাওয়া গেল, তার সারি সারি জানলা-গুলি উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত। বাড়ীর চারিদিককার ময়দান অন্ধকার, সেখানে আরো বহু রিক্শ জমা হয়েছে। যে সব রিক্শওয়ালা অন্যান্য নিমন্ত্রিতদের নিয়ে এসেছে তারা সেই অন্ধকার ময়দানের একস্থানে জমায়েৎ হ'য়ে বসেছে, তাদের গায়ের রং অন্ধকারে মিশে গিয়ে কেবল পরণের সাদা কাপড়-গুলি অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। খালের দিকে ঐ বাড়ীর একটা প্রশস্ত বারান্দা আলোকমালায় অতিশয় উজ্জ্বল, সেখানে

স্ফটিকাধারে অসংখ্য বাতি জ্বলছে, দিকে দিকে অসংখ্য বাতির ঝাড় বসানো। সেখানে প্রকাণ্ড লম্বা ডিনার টেবিলের উপর কারুকার্যখচিত আস্তরণ পাতা, তার উপর নানারকম চীনামাটির পাত্র বসানো, নানা আকারের বোতল, প্রচুর কাচপাত্র সাজানো। ধব্‌ধবে সাদা পোষাক-পরা নিমন্ত্রিতের দল সেখানে খেতে বসেছে, কথাবার্তার গুঞ্জনের এক মুহূর্ত বিরাম নেই। সকলেই চাপা গলায় কথা বলতে চায় কিন্তু কথাগুলো যেন ওদের গলার ভিতর থেকে ভারী আওয়াজে বেরিয়ে আসে। স্থূলকায় খানসামার দল নার্সের মতো লম্বা চাপকান পরে' নগ্নপদে পরিবেশন ক'রে বেড়াচ্ছে, তাদের চলাফেরাতে খস্‌খস্‌ ক'রে শব্দ হচ্ছে। চীনা-মাদুরের ঝালর দেওয়া একখানা মস্ত টানা-পাখা এদের মাথার উপর দুলছে, দেয়ালের আড়াল থেকে কয়েকজন কুলিতে তার দড়ি ধরে টানছে, নিমন্ত্রিতদের ঘর্মাক্ত কপোলে অনবরত পাখার বাতাস লাগছে।

সাত নম্বর রিক্‌শওয়ালা তার আরোহীকে নিয়ে একেবারে বারান্দার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। টেবিলে যারা বসেছিল তারা সকলে আনন্দিত হ'য়ে দাঁড়িয়ে উঠে তাকে সংবর্ধনা করলে। আরোহীকে নামিয়ে দিয়ে রিক্‌শওয়ালা গাড়ী ঘুরিয়ে অপর পাশে গেটের দিকে চলল যেখানে অন্যান্য রিক্‌শওয়ালারা জমায়েৎ হয়েছে। কিন্তু বাড়ীটার মোড় ঘুরতেই সে হঠাৎ কি দেখে এমন চম্‌কে উঠলো, যেন তার মাথায় অকস্মাৎ সজোরে

এক ঘা লাঠি পড়লো। দোতলার উপরকার একটা খোলা জানলার দিকে চেয়ে উজ্জ্বল আলোতে সে বেশ স্পষ্টই দেখতে পেলে—লাল সিল্কের জাপানী আলখাল্লা পরা, লাল পাথরের মালা গলায়, গোল হাত দুটিতে মোটা মোটা সোনার বালা—তার সেই হারানো বধূটি! এদিকে চেয়ে স্পষ্ট সে-ই দাঁড়িয়ে আছে; এখনও ছ'মাস কাটে নি—যে মেয়েটি তার হাঁড়িতে চাল দেবে বলে প্রতিশ্রুত হয়েছিল, ঐ যে সেই! অন্ধকারে সে অবশ্য ওকে দেখতে পায়নি, কিন্তু ও তাকে দেখেই চিনলে,—থমকে দু পা পিছিয়ে গিয়ে সেই অবস্থাতেই ও নিশ্চল হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল।

দাঁড়িয়ে দেখতে দেখতে সে পড়েও গেল না, কিংবা বুকটা তার ফেটেও গেল না,—কাঁচা হ'লেও তার কলিজা বেশ শক্তই ছিল। দু এক মিনিট চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থেকে একটা পুরানো ডুমুর গাছতলায় সে বসে পড়লো; পরীর দেশের গাছের মতো ঐ গাছটার মাথা ছেয়ে জ্বলছিল অসংখ্য জোনাকির আলো। অনেকক্ষণ পর্যন্ত একদৃষ্টে চেয়ে চেয়ে ও দেখলে জানলার ফ্রেমের মাঝখানে মেয়েটি তখনো তেমনি দাঁড়িয়ে আছে, লাল সিল্কের ঢিলা পোষাক তার ক্ষুদ্র দেহটি বেষ্টন ক'রে বাতাসে নড়ছে। হাত তুলে যখন সে মাথার চুলগুলি একবার বিন্যস্ত ক'রে নিলে,—নিটোল তার সেই সুপরিচিত বাহু দুটি তখন খুবই স্পষ্ট দেখা গেল। যতক্ষণ পর্যন্ত মেয়েটি ঘরের ভিতর

ফিরে অদৃশ্য হ'য়ে না গেল ততক্ষণ ও বসে' বসে নির্নিমেষনেত্রে তাকে দেখলে। সে অদৃশ্য হ'য়ে যাওয়ামাত্র ও লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো, গাড়ীর কম্পাস দুটো তুলে ধরে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে ছুটতে একেবারে ফটকের বাইরে চলে গেল। তারপর সে আরো ছুটতে লাগলো; কিন্তু এখন ছুটেছে সে একটা নির্দিষ্ট পথে, নির্দিষ্ট একটা উদ্দেশ্য নিয়ে। হঠাৎ যেন মুক্তি পেয়ে গেছে, এবার নিজের প্রয়োজনে যেদিকে খুশি তাই ছুটে চলেছে।

"জাগ্‌রে তুই জাগ্"—শত শত অতীত যুগের পূর্বপুরুষদের বাক্‌রুদ্ধ সহস্র কণ্ঠ তার অন্তরের ভিতর একসঙ্গে সাড়া দিয়ে ডেকে উঠলো।—"ঝেড়ে ফেল্ যত মায়ার ছলনা, ক্ষণিক জীবনের তুচ্ছ যত ক্ষণিক স্বপ্ন। ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখা কি তার চলে,—বিষের জ্বালায় যে জর্জরিত, বুকে যার তীক্ষ্ণ বাণ এসে বিঁধেছে? যার হৃদয়ে শতগুণ প্রেম, তারই ভাগ্যে শতগুণ যন্ত্রণা। যত দুঃখ, যত শোক, সমস্তই তো এই প্রেম থেকে আসে। ছিঁড়ে ফেল্ সব হৃদয়ের বাঁধন। আর কাজ কি? বিশ্রাম তো বেশিদিনের জন্য নয়, সহস্র সহস্রবার জন্ম নিয়ে আবার ফিরে আসতে হবে এই আদি-মানবের কামনার জগতে, কিন্তু তবু এবারকার মতো তুই বিশ্রাম নে। এই কচি বয়সে সুখের আশায় তুই অনেক ঘুরেছিস, সকলের চেয়ে মর্মঘাতী বাণ তোর বুকে বিঁধে গেছে,—তুই যে করেছিলি প্রেমের আকাঙ্ক্ষা, —তুই করেছিলি নূতনের আশা এই পুরাতন নিরাশার পৃথিবীতে,

যেখানে স্মরণাতীত কাল থেকে বিজেতাই বিজিতের বুকে পা দিয়ে চলে।”

দাস-উপদ্বীপের পথের ধারে ধারে গাছের তলায় সারি সারি দোকান, দূর থেকে তার আলো দেখা যাচ্ছে। ক্ষুধার্ত রিক্‌শ-ওয়ালা ঐ পথের ধারে একটা দোকানে গিয়ে কিছু ভাত আর লঙ্কা-দেওয়া তরকারী কিনে খেলে, তারপর আবার গাড়ী নিয়ে ছুটলো। যে সাপুড়ে বুড়া ঘণ্টাখানেক আগে সাহেবের সেই বাংলোর মধ্যে ঢুকেছিল তারই ভাইপোর একটা ফলের দোকান আছে, রিক্‌শওয়ালা তাকে চেনে, সেই দোকানেই ঐ বুড়া থাকে তাও সে জানতো। সেই দোকানদারটি তখন প্রকাণ্ড এক পাগড়ি মাথায় দিয়ে ফলের ঝুড়িগুলো ঘরের ভিতর টেনে তুলছে, মুখে আছে একটা সিগারেট,—তার ধোঁয়া লেগে চোখ দুটো কুঞ্চিত। ঘর্মাক্ত রিক্‌শওয়ালার পাগলের মতো চেহারা দেখে সে গ্রাহ্যই করলে না। রিক্‌শওয়ালাও কোনো কথা না বলে দোকানের পাটার তলায় গুঁড়ি মেরে ঢুকে একটা ছোট ঝাঁপ ঠেলে খুলে ফেললে,—সে জানে এইখানেই সেই বোবা বুড়াকে পাওয়া যাবে। হাতের মুঠার মধ্যে আছে তার বহুদিনের জমানো একটা মোহর, সেটা পথে আসতে আসতে নিজের কোমরের চামড়ার পেটির ভিতর থেকে ইতিমধ্যে বের ক'রে সে হাতে নিয়েছে। এই মোহরটির জোরে অবিলম্বে তার কার্যসিদ্ধি হলো। একটা দড়িবাঁধা চুরুটের বাক্স হাতে নিয়ে

সে দোকানের তলা থেকে বেরিয়ে এলো। জিনিসটা সংগ্রহের জন্যে তাকে অনেক দাম দিতে হয়েছে বটে কিন্তু বাক্সটা এখন নিতান্ত খালি নয়; ওর মধ্যে যে মূল্যবান্ বস্তুটি আছে তা ভিতর থেকে খুবই নড়াচড়া করছে, ডালার উপর ধাক্কা দিচ্ছে, ফোঁস্ ফোঁস শব্দ করছে।

গাড়ীটা ও তখনো আবার টেনে টেনে নিয়ে চলেছে কেন? তা জানিনা, কিন্তু সেটা টানতে টানতে দৃঢ়পদক্ষেপে সে একেবারে সমুদ্রতীরে গাল্‌ফেস্ প্লেসে গিয়ে উপস্থিত হোলো। সে স্থান তখন একেবারে ফাঁকা, নক্ষত্রের আলোতে রাত্রির অন্ধকারেও অনেকদূর পর্যন্ত দেখা যায়। দূরে কেল্লার আলো মিট্‌মিট্ করে জ্বলছে নিবছে, লাইট-হাউসের মাথা থেকে একটা তীব্র আলোর ছটা তির্যকভাবে রাস্তার দিকে এসে পড়েছে। সমুদ্রের ঢেউ থেকে একটা অস্পষ্ট গুঞ্জনধ্বনি উঠছে,—একটা ঠাণ্ডা বাতাস রিক্‌শওয়ালার গায়ে এসে লাগলো। তার জীবনের মোহ তাকে এই বয়সে যে কম্পাসের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিল সেটা এইবার শেষবারের মতো রাস্তার মাঝখানে ফেলে রেখে একা সে একদৌড়ে সমুদ্রের কিনারায় গিয়ে উপস্থিত হোলো। যে বেঞ্চের উপর কেবল সাহেবদের বসবার অধিকার আছে তারই উপর এখন নির্ভয়ে সে বসে পড়লো।

বুড়াকে সেই গোটা মোহরটা দিয়ে তার বদলে সে চেয়েছিল সকলের চেয়ে তাজা মাল, সবচেয়ে যা বিষাক্ত। পেয়েছিলও

তাই। কী তার কমনীয় রূপ! সারা গায়ে কালো চাকা চাকা দাগ, কেবল ধারে ধারে সবুজের একটু আভাস। সুগোল ফণাটি চক্চকে নীলবর্ণ, তার উপর মরকত মণির মতো উজ্জ্বল আঁকাবাঁকা রেখাচিহ্ন; লেজটি সূক্ষ্মায়মাণ। আকারে দেখতে ছোট, কিন্তু ভয়ানক তেজী ও অতিশয় ক্রূর প্রকৃতি; চুরুটের গন্ধে ভরা কাঠের বাক্সের মধ্যে আবদ্ধ থেকে আরও যেন সে খেপে গিয়েছে। ইস্পাতের স্প্রিংএর মতো ভিতরে এক একবার সঙ্কুচিত হ'য়ে আবার তখনি ফুলে ওঠবার চেষ্টা করছে, বাক্সের ডালার গায়ে থেকে থেকে ধাক্কা দিচ্ছে। রিকৃশওয়ালা প্রথমে বাক্সের উপরকার বাঁধনের দড়িটা একটানে খুলে ফেললে···তারপর কেমনভাবে কি ঘটলো সে কথা সঠিক কে জানে? হাতটা একটু কেঁপে গিয়েছিল, না স্থির ছিল? খুব তাড়াতাড়ি, না ধীরে-সুস্থে সমস্ত ব্যাপারটা ঘটলো? দড়িটা খোলবার পর সে কি আরো কিছুক্ষণ ইতস্তত করেছিল? সমুদ্রের দিকে আর আকাশের তারার দিকে চেয়ে খানিকক্ষণ কি বসেছিল? সেই আলোকোজ্জ্বল ভোজগৃহের উদ্দেশে চেয়ে বারবার দাঁতে দাঁত ঘষে কাউকে অভিশাপ দিয়েছিল? খুব সম্ভব এর কিছুই নয়, ডালাটা তখনি খুলে ফেলে তার বাঁ হাতটা একেবারেই সেই কুণ্ডলীকৃত সর্পের হিম দেহটার উপর রাখলে। দেখা গেছে যে করতলের ঠিক মাঝখানেই সে ছোবল খেয়েছিল।

এ দংশনের কী অসহ্য জ্বালা! একটা বৈদ্যুতিক চাবুকের

আঘাতের মতো এই তীব্র জ্বালা সমস্ত শরীরকে যেন এককালে ছটফটিয়ে দেয়। সে এমন অব্যক্ত যন্ত্রণা যে বাঁদরকে দংশন করলে, বাঁদরগুলো পর্যন্ত তাতে ছট্‌ফট্‌ করে লাফিয়ে ওঠে—একেবারে ছেলেমানুষের মতো, অসহায়ের মতো, মর্মান্তিকভাবে তারাও ডুকরে কাঁদতে থাকে। কিন্তু রিকশওয়ালা বোধ হয় কাঁদেনি, চীৎকারও করেনি, সে তো জেনেশুনেই সব করেছে। তথাপি দারুণ যন্ত্রণায় সে যে বেঞ্চের উপর ঘুরে পড়েছিল তাতে সন্দেহ নেই, কারণ বাক্সটা সেখান থেকে অনেক দূরে ছিট্‌কে পড়েছিল। দংশনের পর এক মুহূর্তেই তার পায়ের তলার মাটি যেন সরে গেল, চারিদিকে অনন্ত অন্ধকার দেখলে—সমুদ্রের জল, আকাশের তারা, হোটেলের আলো, একে একে তার কাছে সমস্তই অদৃশ্য হ'য়ে গেল। সমুদ্র-কল্লোলের মতো একটা প্রচণ্ড শব্দ তার মাথার মধ্যে গর্জন করে উঠে হঠাৎ যেন একেবারে স্তব্ধ হ'য়ে গেল। এইরকম ভাবে দংশিত হ'লে প্রথমটায় মানুষ একবার ক্ষণিকের মতো অজ্ঞান হ'য়ে যায়। কিন্তু শীঘ্র আবার তার জ্ঞান হয়, সঙ্গে সঙ্গে একটা বমির বেগ এসে মুখে রক্ত ঠেলে ওঠে, আবার তখন চৈতন্য লোপ পায়। ঘন ঘন এই রকম মূর্চ্ছা আসতে থাকে আর প্রত্যেকবারে মানুষের খানিকটা ক'রে সত্তা চুরমার হ'য়ে যেতে থাকে। মৃত্যুর পূর্বে যত সে খাবি খায়, জীবনের শিকড়গুলো তত টুকরো টুকরো হ'য়ে ছিঁড়ে যায়। চিন্তা, স্মৃতি, দেখা, শোনা, যন্ত্রণা, শোক, আনন্দ, ঘৃণা,—সমস্তই

ঘুচে যায়,—আর ঘুচে যায় সেই সর্বগ্রাসী চরম পদার্থ যাকে বলি প্রেম, সেই এক অদ্ভুত কামনা যা দৃশ্য-অদৃশ্য সারা বিশ্বকে কেবল নিজের মধ্যে গ্রাস করতে চায়, আবার নিজেকে নিঃস্ব করে সেই সমস্তই অপর জনকে সমর্পণ করে দিতে চায়।···

দিন দশেক পরে এক আসন্ন-ঝটিকাস্তব্ধ গোধূলিতে কলম্বোর বন্দর থেকে চারজন দাঁড়ি একখানা ছোট নৌকা নিয়ে প্রাণপণে দাঁড় টেনে চলেছে সুয়েজ-যাত্রী এক প্রকাণ্ড রাশিয়ান্ জাহাজের অভিমুখে। এই নৌকার মাঝখানে হেলান দিয়ে বসে আছে সেই সাত নম্বর রিক্‌শওয়ালার আরোহী। জাহাজটি ছাড়বার জন্য একেবারে প্রস্তুত হ'য়ে তখন ঘন ঘন শিটি দিয়ে নোঙর তুলে নিচ্ছে। এমন সময় নৌকা তার গায়ে ভিড়লো, আরোহী দড়ির সিঁড়ি বেয়ে ত্বাড়াতাড়ি ডেকের উপর উঠে গেল। জাহাজের কাপ্তেন প্রথমে তাকে জাহাজে নিতে অস্বীকার করলে; বললে যে এ জাহাজে কেবল মাল নেওয়া হয়,—আর জাহাজের এজেণ্টও এখন চলে গেছে, সুতরাং কোনো যাত্রী নেওয়া এখন অসম্ভব। "দয়া করুন, দয়া করুন, দয়া করে আমায় এই জাহাজেই এদেশ থেকে নিয়ে চলুন।" কাপ্তেন অবাক হ'য়ে তার মুখের দিকে চাইলে; আগন্তুক লোকটি দেখতে বেশ সুস্থ বলেই মনে হয়, কিন্তু মুখের উপর যেন কালি

পড়ে গেছে, চশমার অন্তরালে অচঞ্চল চোখ দুটি যেন চেয়ে থেকেও কিছু দেখতে পাচ্ছেনা, কতকটা দিশাহারার মতো। কাপ্তেন বললে—"পরশু পর্যন্ত অপেক্ষা করুন, সেদিন একখানা বড় জার্মান জাহাজ ডাক নিয়ে ছাড়বে।" ইংরেজ ভদ্রলোক বললে—"তা জানি, কিন্তু কলম্বোতে আর দুরাত্রি কাটানোও আমার পক্ষে কষ্টকর। এখানকার হাওয়া আমাকে অত্যন্ত নিস্তেজ করে ফেলেছে,—স্নায়ুদৌর্বল্যে বড়ই কষ্ট পাচ্ছি। তা ছাড়া সেই জার্মান জাহাজখানায় ভয়ানক ভিড় হবে, আমি একটু একলা যেতেই চাই। এদেশের রাত্রিগুলো অনিদ্রায় অনিদ্রায় আমাকে একেবারে কাবু করে ফেলেছে। প্রত্যেক-দিন রাত্রে এখানে ঝড় ওঠে, তখন কী যে স্নায়ুর উদ্বেগ হ'তে থাকে! ঐ দেখুন কী ভয়ানক অন্ধকার, মেঘে মেঘে একেবারে সমস্ত আকাশ ছেয়ে গেছে, আবার আজ রাত্রে ভীষণ ঝড় উঠবে,—এখন তো রীতিমত বর্ষা পড়ে গেল।" ভেবে চিন্তে কাপ্তেন অগত্যা সম্মতি দিলেন। ঋজু-দেহ সিংহলীরা তখন ধরাধরি করে কালো চামড়ার একটা প্রকাণ্ড ব্যাগ নৌকা থেকে টেনে উপরে তুললে, তার আষ্টেপৃষ্ঠে নানা রংএর বিদেশী লেবেল মারা, তাতে লাল কালির বিস্তর ঢেরা দেওয়া সই।

জাহাজের ডাক্তারের থাকবার জন্য একটা কেবিন খালি ছিল, ভদ্রলোককে সেইখানে জায়গা দেওয়া হোলো। ঘরটা খুব ছোট আর অন্ধকার, কিন্তু ইংরেজ ভদ্রলোকের তাই খুব

পছন্দ। জিনিসপত্র সেখানে তাড়াতাড়ি গুছিয়ে রেখে সে ডেকের উপর ফিরে গেল। চারিদিক তখন ক্রমশই অন্ধকারে ঢেকে যাচ্ছে। জাহাজ নোঙর তুলে বাহির সমুদ্রের দিকে পাড়ি দিয়ে চলেছে। পাড়ের দিকে কেল্লাতে অনেক আলো জ্বলছে, দেখে মনে হয় যেন কোন জাহাজ মাস্তুলে আলো জ্বেলে দূর থেকে ক্রমশ আরো দূরে চলে যাচ্ছে। জাহাজের উঁচু রেলিঙের ফাঁক দিয়ে পিছনে চাইলে দেখা যায় বিস্তীর্ণ জলরাশি তীরের দিকে যেন ক্রমাগতই সরে সরে যাচ্ছে। তটভূমিটা দেখাচ্ছে যেন কালো কয়লার একটা পাড়ি-রেখার মতো, তার পিছনে সারি সারি নারিকেল-বন এখন ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন। এখনও জলের একটা সীমা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। আকাশে জমেছে ঘনায়মান বিষণ্ন মেঘ, জাহাজের গতিতে মেঘগুলো এত দ্রুত সরে যাচ্ছে যে খানিকক্ষণ সেদিকে চেয়ে থাকলে মাথা ঘুরে ওঠে। কোথা থেকে এক একটা দম্‌কা জোলো হাওয়া কি-এক বিকৃত গন্ধ নিয়ে হঠাৎ উড়ে আসছে, আবার তখনি ঘুরে অন্যদিকে উড়ে চলে যাচ্ছে। নিঃশব্দ-সঞ্চারী মেঘের রাশি বিদীর্ণ করে হঠাৎ বিদ্যুতের নীল আলো চম্‌কে উঠলো,—সেই আলোতে তীরের সমস্ত গাছপালা, নারিকেল ও কলাগাছের সারি, এমন কি সিংহলীদের কুঁড়েঘরগুলো পর্যন্ত একবার উজ্জ্বল হ'য়ে ক্ষণিকমাত্র দৃষ্টিগোচর হোলো। সঙ্গে সঙ্গে ঝড় উঠলো। ইংরেজ ভদ্রলোক ভয় পেয়ে একবার চোখ

বুজলে, তখনি আবার চোখ চেয়ে দেখলে জাহাজের ডেকটা আর সমুদ্রের সেই অতল জলের তোলপাড়,—তাড়াতাড়ি সে নিজের কামরায় ফিরে গিয়ে আশ্রয় নিলে।

জাহাজের বৃদ্ধ স্টুয়ার্ড বড় তীক্ষ্ণবুদ্ধি, সে ইতিমধ্যে সন্দিগ্ধ-মনে ইংরেজ ভদ্রলোকের কামরার পর্দার আড়াল থেকে কয়েকবার উঁকি মেরে দেখলে, ঐ ভদ্রলোক মোটা চামড়ায় বাঁধানো একটা খাতা পায়ের উপর রেখে একখানি ক্যাম্বিসের চেয়ারে বসেছে। সোনার নিব দেওয়া ফাউন্টেন-পেন নিয়ে খাতাটিতে কি যেন লিখছে। যখনই সে মুখ তোলে তখনই তার চশমাটা চক্‌চক্ করে,—দেখলেই মনে হয় কত যেন ভাবছে, অথচ চাউনি একেবারে অর্থহীন। খানিক পরে কলম রেখে সে নিবিষ্ট হ'য়ে চুপ ক'রে বসে রইল, কেবিনের গায়ে অনবরত যে তরঙ্গাঘাতের শব্দ হচ্ছে তাই যেন সে কান পেতে শুনতে লাগলো। হাতের চাবির গোছা ঝন্‌ঝন্ ক'রে বাজাতে বাজাতে স্টুয়ার্ড দরজার পাশ দিয়ে চলে গেল। ইংরেজ ভদ্রলোক তখন দাঁড়িয়ে উঠে গায়ের জামা খুলে ফেললে। ওডিকলোনের জল দিয়ে বেশ করে মাথাটা ভিজিয়ে নিয়ে একবার মুছলে, দাড়ি কামালে, কাঁচি দিয়ে সমান করে গোঁফ ছাঁটলে, অনেক যত্নে বুরুষ দিয়ে চুলের প্রসাধন করলে, নতুন ডিনারের পোষাক পরলে, তারপর সৈনিকের মতো দৃঢ়পদক্ষেপে ঘর থেকে ডিনার খেতে বেরিয়ে গেল।

জাহাজের লোকেরা টেবিলে খেতে বসে অনেকক্ষণ থেকে তার জন্য অপেক্ষা করে বিরক্ত হ'য়ে উঠেছিল, কিন্তু তাকে উপস্থিত দেখে যথেষ্ট সৌজন্য করলে, নিজেদের ইংরেজী বিদ্যা অনুসারে তার সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করলে। সেও যথেষ্ট ভদ্রতা দেখালে,—বললে সে রাশিয়ান্ রান্না খুব পছন্দ করে, রাশিয়াতে সে একবার গিয়েছিল, সাইবেরিয়াতেও গিয়েছে···আরো কত কত দেশ সে ঘুরে বেড়িয়েছে, কোথাও তার কোনো অসুবিধা হয়নি, কেবল এইবার ভারতবর্ষে জাভাতে আর সিংহলে এসে তার বড় কষ্ট হয়েছে ; স্নায়ুগুলো বিগ্‌ড়ে গেছে,—মেজাজটাও তাই কেমন অদ্ভুত হ'য়ে উঠেছে। এই এক ঘণ্টা আগেই জাহাজে উঠে যে আচরণ সে দেখালে তাতেই হয়তো সকলে খানিকটা পরিচয় পেয়েছেন।···কাফি খাবার সময় সে নিজের পয়সায় জাহাজের কর্মচারীদের বহুমূল্য পানীয় খাইয়ে আপ্যায়িত করলে ; নিজের ঘর থেকে দামী ইজিপ্সিয়ান সিগারেট এক বাক্স এনে টেবিলের উপর খুলে ধরলে, সকলকেই তা ব্যবহার করতে অনুরোধ করলে।

জাহাজের কাপ্তেনটির এখনও অল্প বয়স, চোখ দেখলে মনে হয় বেশ চালাক, সর্বদাই ইউরোপীয় আভিজাত্যের পূরা চাল বজায় রেখে সে চলে। সে ইউরোপের বর্তমান উপনিবেশ-সমস্যা নিয়ে কথাবার্তা শুরু করলে,—জাপানের সম্বন্ধে, পূর্ব-ভূখণ্ডের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেক কথা বললে। ইংরেজ ভদ্রলোক-

ধীরভাবে সব কথা শুনতে লাগলো, কখনো বা তার সমর্থন, কখনো বা তার প্রতিবাদও করলে। তার নিজের মতামত সে বেশ থেমে থেমে বলতে লাগলো, যেন কোনো সুলিখিত প্রবন্ধ থেকে বলছে। কিন্তু মধ্যে মধ্যে সে হঠাৎ চুপ করে যায়, বাইরের সমুদ্র-কল্লোলটা উৎকর্ণ হ'য়ে শোনে। গভীর সমুদ্র, এখানে আর ঝড় নেই। কলম্বোর তটভূমিতে আলোকবিন্দু-গুলো আগে হীরার টুক্রার মতো ঝিক্‌মিক্ করতে দেখা গিয়েছিল, কখন সে সব ঐ বিশাল কালো মখমলের মতো জলের তলায় তলিয়ে গেছে। জাহাজের চতুর্দিক এখন অসীম অন্ধকারে ঘেরা,—সমুদ্রও অন্ধকার, রাত্রিও অন্ধকার। ডিনার খাবার কেবিনটা খোলা ডেকের উপর, তার জানলা-দরজার বাইরে অন্ধকারের গাঢ় কালিমা; সেদিকে চাইলেই মনে হয় অন্ধকারটা যেন চারদিক থেকে ঘিরে এসে এই আলো-করা কেবিনের মধ্যে উঁকি মারছে। এই অন্ধকার ভেদ করে উড়ে আসছে একটা জোলো হাওয়া,—পৃথিবীর আদিকাল থেকে ছাড়া পাওয়া কারো উদার দীর্ঘনিঃশ্বাসের মতো; টেবিলে উপস্থিত সকলের গায়ে এই মুক্ত বাতাস লেগে তাদের দামী সিগারেটের আর কাফি-পানীয়ের সৌরভটুকু যেন আরো তাদের মধ্যে ছড়িয়ে দিচ্ছে। মাঝে মাঝে এক একবার দপ্ করে ইলেট্রিক্ বাতিগুলো সব নিবে যায়, আর সঙ্গে সঙ্গে দরজা-জানলার চতুষ্কোণ ফ্রেমের মধ্যে বাইরের অন্ধকারের নীলাভা

যেন উজ্জ্বল হ'য়ে দেখা দেয়; তখন বোঝা যায় অতলস্পর্শ শূন্যতার কি স্নিগ্ধ নীলিমা। শব্দশূন্য, সীমাশূন্য, জাহাজের চারপাশে কেবল এই শূন্যতা ছাড়া আর কিছু নেই। নৃত্যশীল জলরাশি চক্‌চক্ করে; আকাশের দিগঞ্চল যেন কয়লার মতো কালো মসীতে আচ্ছন্ন। মাঝে মাঝে অতি দূর থেকে গুর্‌গুর্ করে ওঠে গম্ভীর মেঘগর্জনের নির্ঘোষ, সমস্ত বস্তুজগতের ভিত্তি পর্যন্ত তাতে কেঁপে ওঠে; মনে হয় স্বয়ং বিধাতা যেন সৃষ্টি করতে বসে উদ্দেশ্যহারা হ'য়ে থেকে থেকে এমনি অসহিষ্ণুতার ধ্বনি করছেন। ইংরেজ ভদ্রলোক এই সময় বসে থাকতে থাকতেই একেবারে অসাড় হ'য়ে যায়।

"ওঃ কি ভয়ানক"—একবার বিদ্যুৎ চমকের সঙ্গে সঙ্গেই এই কথা বলে উঠে গিয়ে সে দরজার কাছে দাঁড়ালো। যেন আপনার মনেই বলতে লাগলো—"বড়ই ভীষণ ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে। আর সকলের চেয়ে যা মারাত্মক তা হচ্ছে এই যে আমরা এই সব আর কিছু ভাবি না, ভাবতে পারি না, অন্তরে অনুভব করতেও ভুলে গেছি, কেমন করে যে ভয়ানকের উপলব্ধি হয় তাও যেন আমরা ভুলে গেছি।"

কাপ্তেন জিজ্ঞাসা করলে—"কিসের বিষয় নিয়ে বলছেন?"

"এই ধরুন না কেন, আমাদের পায়ের তলায় এই যে রয়েছে অতলস্পর্শ গভীর সমুদ্র, যার কথা কত শ্রদ্ধার সঙ্গে বাইবেলে পর্যন্ত লেখা আছে,—চোখের সুমুখে বিস্তৃত হ'য়ে

থাকলেও তার কথা কি আমরা এখন একটুও মনের মধ্যে ভাবছি ?” অন্ধকারের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে সে বলতে লাগলো—“ওঃ, দূরে কাছে সর্বত্র কেবল ঢেউ আর ফেনা, থেকে থেকে ওর মধ্যে অদ্ভুত রকম সবুজ জ্যোতি দেখা যাচ্ছে, অন্ধকার একটা প্রকাণ্ড শকুনির ডানার মতো চারদিক থেকে চেপে ধরেছে,...আচ্ছা কাপ্তেনি করা বড় বিপদের কাজ,—না ?”

কাপ্তেন নিতান্ত তাচ্ছিল্যের ভাব দেখিয়ে বললে,—“কৈ না, মোটেই তা মনে হয় না। একঘেয়ে কাজ, অনেক দায়িত্ব আছে বটে, কিন্তু এমন বিশেষ কিছু কঠিন নয়। সমস্তই অভ্যাসের ব্যাপার—”

“তার চেয়ে বরং বলুন আমাদের সকল বিষয়ে এমনি হৃদয়-হীনতারই একটা অভ্যাস এসে গেছে। আপনার ঐ ব্রিজের উপর দাঁড়িয়ে যখন দেখি ওর দু-পাশ থেকে মোটা কাচের ভিতর দিয়ে সবুজ আর লাল দুটো আলো কেবল দুটো চোখের মতো জ্বলছে, রাত্রির বিরাট অন্ধকারের মধ্যে এই সামান্য জাহাজটুকুর আশ্রয়ে কোথায় ভেসে চলেছি, চারিদিকে মাইলের পর মাইল বিস্তীর্ণ অকুল-পাথারের মধ্যে ভেসেই চলেছি এমনি ভাবে,—ভাবতে গেলে তখন মনে হয় এ কেবল নিতান্ত অসম-সাহসিক পাগলের কাজ।” বাইরের দিকে চেয়ে আবার সে বললে—“আরো ভেবে দেখুন, সেও তো বড় কম কথা নয়, নীচে গিয়ে যখন কেবিনের মধ্যেই আশ্রয় নিয়ে শুয়ে থাকি,—

সেখানে তো সামান্য একটু পাতলা কাঠের ব্যবধান আছে মাত্র, মাথার কাছে অনবরত সেই কাঠের ব্যবধানটুকুর উপর বাইরে থেকে অতলস্পর্শ সমুদ্রের ঢেউ এসে বারে বারে ধাক্কা মারছে! …ভেবে দেখলে একথা মানতেই হবে যে সামান্য একটা পিঁপড়ের বা অন্য একটা জানোয়ারের কিংবা একটা অসভ্য মানুষের মধ্যেও দেখা যায় যে অন্তত নিজস্ব স্বভাবটুকু তাদের ঠিক বজায় থাকে, কিন্তু আমাদের দেখুন তাও নষ্ট হ'য়ে গেছে, ক্রমশ আরো নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে।"

কাপ্তেন একটু হেসে উত্তর করলে—"তা যাই বলুন, পিঁপড়ের যতই বোঝবার শক্তি থাক, তারা কখনো জাহাজে এমন পৃথিবী পর্যটন করতে পারে না, ইলেক্‌ট্রিসিটির সদ্ব্যবহারও করতে পারে না, আর বিনাতারে টেলিগ্রাফও করতে পারে না। এই মুহূর্তেই ইচ্ছা করলে আমি এডেন বন্দরের সঙ্গে কথা কইতে পারি,—দেখতে চান? অথচ এখান থেকে সেটা পাকা দশ দিনের পথ।"

পাশের একজন ইঞ্জিনিয়ার এই কথায় হাসতে আরম্ভ করেছে দেখে চশমার ভিতর দিয়ে একবার তার দিকে তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ইংরেজ ভদ্রলোক বললে—"আপনি হাসতে হাসতে যা বলছেন এটাও বড় ভয়ানক কথা, শুনলে আগের লোকে ভয় পেতো, কিন্তু আমাদের ভয় নেই। আসলে আমরা কিছুকেই আর ভয় করি না। আমরা মরণকেও গ্রাহ্য

করি না, জীবনকেও গ্রাহ্য করি না। ভয় আমরা আর জীবনের কোনো রহস্যকেই করি না। এই অসীম সমুদ্রকেও ভয় করি না, এমন কি মৃত্যুকেও ভয় করি না,—নিজের মৃত্যুকেও না, পরের মৃত্যুকেও না। আমি সৈন্য-বিভাগের একজন উচ্চ কর্মচারী ছিলাম, যুদ্ধে রীতিমত লড়েছিলাম; কামানের গোলা মেরে আমি শত শত মানুষকে হত্যা করেছি; কিন্তু তবু দেখুন এখন নিশ্চিন্তই আছি। খুন করেছি বলে কাতরও হচ্ছি না, পাগলও হ'য়ে যাচ্ছি না,—কত যে শত শত লোকের মৃত্যু হয়েছে আমার হাতে সে কথা একবারও মনে ভাবি না।"

কাপ্তেন জিজ্ঞাসা করলে—"আর জন্তু-জানোয়ারেরা কিংবা অসভ্য মানুষেরা কি করে? তারাই বুঝি ঐ সকল কথা বসে বসে ভাবে?"

"অসভ্য মানুষেরা অন্তত এইটুকু বিশ্বাস করে যে যেটা ঘটনীয় তাই ঘটে যাচ্ছে, কিন্তু আমরা তাও করি না"—এই কথা বলে ইংরেজ ভদ্রলোক চুপ করে থেকে উত্তেজিতভাবে ঘরের মধ্যে কেবল পাদচারণ করতে লাগলো।

দূরে আকাশের তারাগুলো মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে, বিদ্যুদ্দাম অনেকটা কমে গেছে। ঠাণ্ডা বাতাস আরো জোরে বইতে লাগলো, বাইরের সূচীভেদ্য অন্ধকার আরো গভীর হ'য়ে উঠলো। জাহাজের দোলানিতে শৌখীন ঝিনুকের একটা ছাইদানি টেবিলের উপর গড়িয়ে বেড়াতে লাগলো। অনবরত দোল

খেতে খেতে মনে হয় পায়ের তলায় একটা প্রবল শক্তি ক্রমাগত যেন পুঞ্জীভূত হ'য়ে একবার ঠেলে উপরের দিকে উঠছে আবার নীচে নেমে যাচ্ছে, আর জাহাজের মেঝেটা যেন সঙ্গে সঙ্গে সেই দিকে তলিয়ে যাচ্ছে। উপস্থিত সকলে কাফি খাওয়া ও ধূমপান শেষ ক'রে কিছুক্ষণ আড়চোখে এই অদ্ভুত যাত্রীটির ভাবভঙ্গী চেয়ে চেয়ে দেখলে, তারপর দাঁড়িয়ে উঠে 'গুড্‌নাইট' বলে টুপি হাতে ক'রে বিদায় নিলে। কেবল কাপ্তেন চুরুট মুখে দিয়ে সেখানে বসে রইল। আরোহীও একটা চুরুট হাতে নিয়ে আপনার মনে এক দরজা থেকে আর এক দরজা পর্যন্ত ক্রমাগত ঘুরতে লাগলো। জাহাজের বৃদ্ধ স্টুয়ার্ড টেবিল পরিষ্কার করতে এসে অসন্তুষ্ট চিত্তে এই চশমা-পরা আন্‌মনা যাত্রীর দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলো।

কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ উত্তেজিত হ'য়ে সে বলে উঠলো—"হাঁ হাঁ, এইটেই আমাদের পক্ষে সবচেয়ে মারাত্মক কথা যে আমরা আজ ভয় পেতে ভুলে গেছি। আমাদের কোনো ভগবানও নেই, কোনো ধর্মও নেই—ও সব অনেক কাল থেকেই ঘুচে গেছে। ব্যবসা আর অর্থের লোভ ক'রে ক'রে আমরা বরফের মতো অসাড় হ'য়ে গেছি, জীবন বা মৃত্যু—এর কোনোটাকেই আর বুঝি না। যদিও বা মৃত্যুকে কিছু ভয় করি তাও অন্য কারণে, কিংবা হয়তো সেই আদিম জন্তুপ্রকৃতির এখনো কিছু অবশিষ্ট আছে বলে। কখনো কখনো চেষ্টা করি ভয়টা মনের

মধ্যে আনতে বা সেটাকে বড় ক'রে দেখতে,—কিন্তু কোনো সাড়া জাগে না, কত ভীষণ ব্যাপার যে মানুষের জীবনে ঘটছে তার কিছুই উপলব্ধি হয়না।···আমিই এখন যেটাকে ভয়ের জিনিস বলছি, আমিই সেটাকে ঠিক উপলব্ধি করছি না"—আঙুল দিয়ে সে দরজার বাইরের দিকে নির্দেশ করলে, যেখানে অন্ধকার জলরাশি জাহাজকে অবিরত দোলা দিচ্ছে, আর জাহাজের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে চড়্‌চড়্ ক'রে শব্দ হচ্ছে।

কাপ্তেন ধীরভাবে বললে—"সিংহলে এসেই বোধ হয় আপনার এই মানসিক অবস্থা হয়েছে?"

ভদ্রলোক অন্যমনস্কভাবে সায় দিলে—"ঠিক বলেছেন, সে তো নিশ্চয়ই। দেখুন, আমরা যত ব্যবসাদার ইঞ্জিনিয়ার রাজনীতিজ্ঞ ঔপনিবেশিক সৈনিক—সকলেই আমরা নিজেদের আড়ম্বরপূর্ণ একঘেয়ে জীবন ছেড়ে মধ্যে মধ্যে পালিয়ে আসি, ছাড়া পেয়ে পৃথিবীময় ঘুরে বেড়াই। দেখছেন তো ইউরোপীয় দেশ-পর্যটকের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে, সারা পৃথিবী দেশ-ভ্রমনের বিজ্ঞাপনে আর ট্রেণ-জাহাজের টাইম-টেব্‌লে ছেয়ে ফেলেছে। আমরা প্রাণপণে চেষ্টা করছি নিজেদের মুগ্ধ করতে,—কখনো তাই সুইজারল্যাণ্ডের পাহাড় ও হ্রদ দেখতে যাই, কখনো যাই ইটালীর প্রাচীন ভাস্কর্যের নিদর্শন দেখতে; সিসিলির সেই এম্ফিথিয়েটারের পাথরের স্তূপ, যা এখন ছাতা ধরে পিছল হ'য়ে গেছে, তার উপর দিয়েই খানিক ঘুরে বেড়াই;

গ্রীসের প্রাচীন শহরের পাথরগুলো ভেঙে-চুরে হল্‌দে রং ধরে গেছে, সেখানে গিয়েই কৃত্রিম আনন্দে চেয়ে থাকি, ভাবতে চেষ্টা করি কতই অপরূপ দেখলাম ; জেরুজেলামে যখন পবিত্র অগ্নি-উৎসব করে তখন সেখানে আমরাও গিয়ে এমন ভিড় ক'রে জুটি যেন মেলাতে সং দেখতে এসেছি ; ঈজিপ্টে কতকগুলো ভাঙা মন্দির আর পুরানো কবর দেখবার জন্যে গাইড্‌দের কতই অর্থদণ্ড দিই, তাদের কতই অত্যাচার সহ্য করি। ঠিক এমনি-ভাবের কৌতূহল নিয়েই জাহাজে চড়ে বেড়াতে আসি ভারতবর্ষ, চীন, জাপান ; কিন্তু এই সব দেশে এসে আমরা দেখি অন্য জিনিস। যেখানে সকলের চেয়ে প্রাচীন মানুষেরা প্রথম যুগ থেকে আজ পর্যন্ত বাস ক'রে আসছে,—এই সব দেশ এখন আমরা দখল ক'রে নিয়ে আমাদের উপনিবেশ বলে পাহারা দিয়ে রক্ষা করি—এখানে যদিও দেখি চতুর্দিকে কেবল অপরিচ্ছন্নতা, আর প্লেগ, কলেরা, ম্যালেরিয়া, আর তারই মধ্যে নানাবর্ণের অদ্ভুত মানুষগুলো যদিও নিতান্ত গরু ছাগলের মতোই বাস করে,—কিন্তু কেবল এখানে এসেই আমরা জীবন মৃত্যু আর দেবতাদের সম্বন্ধে কিছু কিছু যেন উপলব্ধি করি। ওসাইরিস্‌, জিউস্‌, এপোলোন, খৃষ্ট, মহম্মদ, কোনো দেবতার কথাই আমি কখনো গ্রাহ্য করতাম না, কিন্তু এখানে এসে দেখলাম মানুষের প্রথম যুগের গড়া যে সব অদ্ভুত দেবতার মূর্তি,—ঐ যে বিশখানা হাত-ওয়ালা ব্রহ্মা, ঐ শিব, আর ঐ বুদ্ধ

অবতার, যাঁর বাণী স্বয়ং ঈশ্বরের বাণীর মতো একদিন মৃত্যুর গুপ্ত রহস্যে পর্যন্ত আঘাত করেছিল,—অনেকবার আমার মনে হয়েছে এই সব দেবতার কাছে নিঃসঙ্কোচে মাথা নোয়াতে পারা যায়।...আজ যে আমি এ সব কথা ভাবতেও পারছি, অনুভব-শক্তি যে এখনও আমার আছে সে কেবল এই প্রাচ্য দেশে এসেছিলুম বলে, এখানকার রোগ-পীড়ায় নিজেও ভুগে দেখেছি বলে। আমি আফ্রিকায় গিয়ে স্বহস্তে শত শত লোককে হত্যা করেছি, ভারতবর্ষে গিয়ে সহস্র সহস্র লোককে অনাহারে মরতে দেখেছি, চীনে গিয়ে অসহায় গরীবদের চাবুক মেরেছি, জাভায় আর সিংহলে গিয়ে রিক্‌শওয়ালাদের কণ্ঠশ্বাস ওঠা পর্যন্ত হরদম ছুটিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছি, কোথাও গিয়ে বিষম জ্বরে ভুগেছি, কোথাও লিভারের রোগে ভুগেছি,—এমনি ক'রে অনেক দেখে-শুনে তাই আজ আমি এত কথা ভাবতে পারছি। যে সব দেশের অসংখ্য অধিবাসী হয়তো এখনো সেই আদি যুগের মানবশিশুর মতোই বাস করছে, আপনার সমস্ত সত্তা দিয়ে জীবনকে মৃত্যুকে আর বিধাতার সৃষ্টি-মাহাত্ম্যকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করতে পারছে, যারা হয়তো বহুযুগ ধরে ইতিহাস ধর্ম ও দর্শন নিয়ে অনবরত আলোচনা করতে করতে বহুপথ অগ্রসর হ'য়ে এখন শ্রান্ত হ'য়ে থেমে গেছে,—লৌহযুগের নতুন মানুষ হ'য়ে আমরা তাদের উপরে করি আধিপত্য, নিজেদের মধ্যে তাদের ভাগাভাগি করে ভোগ করতে চাই আর একেই বলি

উপনিবেশ-সমস্যা! ভাগাভাগি যখন শেষ হ'য়ে যাবে তখন জগতে হয়তো এক নূতন রাজছত্রের প্রতিষ্ঠা হবে, আসবে তখন এক নূতন রোম রাজ্য। আবার তখন সেই কথার পুনরাবৃত্তি শোনা যাবে,—যে কথা বাইবেলের ঋষিরা সিডোনকে বলেছিলেন, যে কথা এপোক্যালিপ্স্ রোম সম্বন্ধে বলেছিলেন, যে কথা ভগবান বুদ্ধ ভারতের আর্য রাজাদের সম্বোধন করে বলেছিলেন—'হে ঐশ্বর্যগর্বিত শক্তিদৃপ্ত রাজন্যগণ, তোমরা কেবল পরস্পরকে ঈর্ষা কর, তাতে আপন আপন অতৃপ্ত লোভেরই ইন্ধন যোগাও…।' এই যে মায়ার জগৎ, যার অস্তিত্বের প্রকৃত কারণ আমাদের ধারণার অতীত, এখানে মানুষের আপন পার্থিব ব্যক্তিত্বের মূল্য যে কতটুকু তা বুঝেছিলেন সেই বুদ্ধ, তাই তিনি মহা আতঙ্কে শিউরে উঠেছিলেন। আর আমরা এই ব্যক্তিত্বকেই দিয়েছি সকলের চেয়ে বড় স্থান। যতই কেন আমরা বিশ্বজনীন সাম্য আর সখ্য আর ভ্রাতৃভাবের বড় বড় কথা বলি, আসলে কিন্তু পৃথিবীকে আমরা নিজ নিজ ব্যক্তিত্বের মধ্যেই একান্ত করে দেখতে এবং পেতে চাই। কেবল এই সমুদ্র-বক্ষে যখন আসি, এই অজানা নক্ষত্ররাজির নীচে, এই ঝড়-তুফানের মধ্যে যখন ভাসি,—আর এই ইতিহাস-কাহিনীতে ভরা ভারতবর্ষে বা সিংহলে এসে যখন একেবারে আদিম মানবের হুবহু প্রতিকৃতি আমাদের নজরে পড়ে,—যখন দেখতে পাই এখানকার গুমোট অন্ধকারের বিপুল নিস্তব্ধতার মধ্যে

মানুষের জীবন কেমন করে নিঃসাড়ে মিলিয়ে যায়, এখানকার বাতাসের গন্ধের মতো অন্ধকারের সঙ্গে একাকার হ'য়ে মিলিয়ে থাকে, কেবল তখনই আমাদের আত্মসর্বস্ব ব্যক্তিত্বের যে কতটা দাম তার সামান্য খানিকটা আভাস পাই।"

চশমাটার কাচের ভিতর থেকে কাপ্তেনের মুখের পানে অদ্ভুত রকমের দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আবার সে বললে—"বৌদ্ধদের গ্রন্থে একটা গল্প আছে জানেন?"

কাপ্তেন হাতের আড়ালে হাই তুলতে তুলতে ঘড়ির দিকে একবার চেয়ে বললে—"কোন গল্প?"

"একটা হাতী পাহাড় থেকে বেরিয়ে যখন সমুদ্রের দিকে ছুটেছিল, একটা দাঁড়কাক তখন তার পিছু নিয়েছিল। পথের দুধারের সমস্ত গাছপালা ভাঙতে ভাঙতে সমুদ্রে এসে পৌঁছেই হাতী মরিয়া হ'য়ে ঢেউয়ের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লো, দাঁড়কাকটাও তার মাংস খাবার লোভে তখন সঙ্গে সঙ্গে উড়লো। হাতীটা যখন মরে গিয়ে পেট ফুলে ঢেউয়ের উপর ভেসে উঠলো, দাঁড়কাকটা তখন তার মৃতদেহের উপর বসে প্রাণভরে মাংস খেতে লাগলো। মৃতদেহটা যখন ভাসতে ভাসতে অনেক দূর চলে গিয়েছে, তখন দাঁড়কাকটার চৈতন্য হোলো; তীর থেকে তখন এতদূরেই গিয়ে পৌঁছেচে যে ফেরবার আর উপায় নেই; তখন সে তারস্বরে এমনভাবে ডাকতে লাগলো যে-ডাক শোনবার জন্যেই মৃত্যু শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করে।...কি ভয়ানক গল্প!"

কাপ্তেন তাচ্ছিল্যের ভাবে বললে—"হাঁ, গল্পটার একটা কিছু উদ্দেশ্য আছে।"

ইংরেজ ভদ্রলোক নিস্তব্ধ হ'য়ে আবার ঘুরে বেড়াতে লাগলো। অন্ধকার মথিত ক'রে জাহাজের ঘণ্টা দ্বিতীয়বার উঠলো বেজে। কাপ্তেন ভদ্রতার খাতিরে আরো পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করে উঠে দাঁড়ালো, যাত্রীর সঙ্গে করমর্দন করে নিজের কেবিনে চলে গেল। ভদ্রলোক তখনো একা একা কি ভাবছে আর পায়চারি করছে। জাহাজের বৃদ্ধ স্টুয়ার্ড আধঘণ্টাকাল অপেক্ষা ক'রে রেগে উঠে সেখানকার সমস্ত আলোগুলো নিবিয়ে দিলে, কেবল একটি আলো জেলে রাখলে। সে চলে গেলে ভদ্রলোক সেটাও দিলে নিবিয়ে। সমস্ত অন্ধকার হ'য়ে গেল, মনে হোলো যেন ঢেউয়ের গর্জনও সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে উঠলো। বাইরের নক্ষত্রখচিত আকাশ আর জাহাজের মাস্তলের দড়ি-দড়া জানলার ভিতর থেকে দেখা যেতে লাগলো। চড়্‌চড়্‌ শব্দ করতে করতে জাহাজ এক ঢেউ থেকে আর এক ঢেউয়ের মাথায় নামতে উঠতে লাগলো। বড় বড় দোলা খেয়ে জাহাজ এগিয়ে চলতে থাকে; সেই সঙ্গে আকাশের নক্ষত্রগুলোও যেন দুলে দুলে একবার নীচে তলিয়ে গিয়ে আবার উপরে উঠে পড়ে, আর আকাশে তার জ্যোতির লেখা ছল্‌ছল্‌ করে।

চ্যাংএর স্বপ্ন

কার বিষয় নিয়ে গল্প বলা হচ্ছে সে বিচারে কি দরকার? সকলেই হ'তে পারে গল্পের নায়ক; এই মাটির ধরিত্রীতে যে-কেউ একবার জন্মেছে তাকে নিয়েই চমৎকার গল্প তৈরী হয়।

একদিন চ্যাংও জন্মেছিল এই মাটির পৃথিবীতে। যেদিন প্রথম সে চোখ মেলে চেয়ে দেখলে এই বিশাল পৃথিবী, তার কিছুদিনের মধ্যেই ওর জুটে গেল একজন কাপ্তেন মনিব, আর সেই দিন থেকে ওর জীবন-কাহিনীটা ঐ কাপ্তেনের সঙ্গে একসূত্রে গাঁথা হ'য়ে গেল। সে অনেক দিনের কথা,—তারপর ছ'বছর সময় পার হ'য়ে গেছে; জাহাজের বালির ঘড়িতে যেমন বালিগুলো ঝুর্‌ঝুর্ ক'রে ঝ'রে পড়ে তেমনি ক'রে ওর জীবনের দিনগুলো এই কয় বছরের মধ্যে একে একে ঝ'রে কোথায় তলিয়ে গেছে।...

চ্যাং এখন ভাবে, এই যে এলো একটা রাত্রি,—এ স্বপ্ন, না জাগরণ? আবার এই যে হোলো একটা দিন,—এও কি স্বপ্ন, না এটা জাগরণ? চ্যাং এখন বুড়ো হ'য়ে গেছে। সে নেশার

ঘোরে থাকে, কেবল ব'সে ব'সে ঝিমোয় আর এই সব কথা ভাবে।

বাইরে ওডেসা শহরে দারুণ শীত। দিনটা অত্যন্ত মেঘলা আর ঘোলাটে—চীনদেশে চ্যাং যেদিন প্রথম কাপ্তেনের কাছে আসে সে দিনটাও ঘোলাটে ছিল, কিন্তু এ তার চেয়েও খারাপ। ঝোড়ো হাওয়ায় বরফের কণাগুলো তীরের মতো ছুটেছে; সমুদ্রতীরের প্রশস্ত পথ জনবিরল,—যে দুএকজন পথিক পকেটের মধ্যে হাত ভ'রে ঘাড় নীচু ক'রে কোনোগতিকে সেই পিছল পথে চলেছে তাদের মুখে এসে বিঁধছে তুষারের ঝাপ্‌টা। বন্দরের জেটি জনশূন্য, দূরে অপর পারে কেবল পতিত জমি ধূ ধূ করছে, অস্পষ্ট ঝাপসা মতোই তা দেখা যায়। জাহাজঘাট ঘন কুয়াশায় আচ্ছন্ন; ফেনশীর্ষ উন্মত্ত ঢেউগুলো উদয়াস্ত সেই শূন্য ঘাটের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। সোঁ সোঁ শব্দে ঝড়ের বাতাস লেগে টেলিফোনের তারগুলো কে যেন ঝনঝনিয়ে নাড়া দিয়ে দিচ্ছে।...

এমন দিনে শহরের জীবনযাত্রা খুব সকাল থেকে শুরু হয় না, একটু বিলম্ব হয়। চ্যাং আর তার কাপ্তেনেরও ঘুম ভাঙতে অনেক বিলম্ব হয়। ছ'বছর—সে কি খুব অনেক সময়? কাপ্তেনের বয়স যদিও এখনও চল্লিশ পার হয়নি, তবু এই ছ'বছরের মধ্যে কাপ্তেন আর চ্যাং দুইজনেই তাড়াতাড়ি বুড়ো হয়ে গেছে। ভাগ্য ওদের জীবনকে নির্মমভাবেই বদলে বদলে

দিয়ে গেছে। এখন আর ওরা আগের মতো সমুদ্রযাত্রায় বেরোয় না—কেবল তীরেই বাস করে। প্রথমে ওরা জাহাজ ছেড়ে এসে যেখানে বাসা নিয়েছিল সেখানেও আর এখন থাকে না, এখন থাকে অন্ধকার গলির মধ্যে একটা এঁদো ঘরে। বাড়ীটাতে ঢুকলেই নাকে আসে কাঁচা কয়লার একটা ভ্যাপ্‌সা গন্ধ; সেখানে কতকগুলো ইহুদি বাস করে,—তারা সমস্ত দিনটা বাইরে কাটায় আর সন্ধ্যাবেলা ঘরে ফিরে মাথার টুপি না খুলেই একেবারে খেতে বসে যায়। চ্যাং আর কাপ্তেন যে ঘরে থাকে সেটা যেমন নীচু তেমনি ঠাণ্ডা। ঘরটা সর্বদাই অন্ধকার; কেবল ঘুলঘুলির মতো দুটি ছোট জানলা আছে, ঠিক যেন জাহাজের কেবিনের সেই পোর্টহোলের মতো। দুই জানলার মাঝে একটি দেরাজ-আলমারি, আর বাঁদিকের দেয়াল ঘেঁসে পাতা রয়েছে একটা পুরোনো লোহার খাট,—আসবারের মধ্যে কেবল এই,—আর আছে ঘর গরম রাখবার জন্য একধারে একটি চুলা।

চ্যাং শোয় সেই চুলার ধারে আর কাপ্তেন শোয় খাটে। কিন্তু কেমন চমৎকার সে খাট আর কেমন চমৎকার তার বিছানা তা এই সব বাসাড়ে ঘরে যে কখনো বাস করেছে সেই জানে; খাটের মাঝখানটা ঝুলে গিয়ে একেবারে জমি স্পর্শ করেছে, আর তার ময়লা বালিশটা এত পাতলা, যে কাপ্তেন নিজের কোটটা মুড়ে তার তলায় গুঁজে খানিকটা উঁচু ক'রে দিয়ে তবে শুতে পারে। কিন্তু এই বিছানায় শুয়েও কাপ্তেন এখন স্বচ্ছন্দে

ঘুমোয়; চিৎ হ'য়ে শুয়ে চোখ বুজে সে একেবারে মড়ার মতো নিস্পন্দ হ'য়ে পড়ে থাকে। জাহাজে বাস করবার সময় তার আগেকার দিনের বিছানা কত সুন্দর ছিল! নীচে কয়েকটা দেরাজ, তার ওপর ছিল উঁচু বিছানা; মোটা গদি, তার ওপর ধব্‌ধবে চাদর, আর তুষারশুভ্র নরম বালিশ। কিন্তু সেরকম বিছানায় শুয়ে সমুদ্রের ঢেউয়ের দোলা খেয়েও তখন তার এখন-কার মতো গভীর ঘুম হোতো না। এখন সে দিনের বেলাই ক্লান্ত হ'য়ে পড়ে, তা ছাড়া এখন আর তার তেমন ঝক্কিই বা কি আছে,—রাত্রে শোবার সময় সে কোন কথাই বা ভাব্‌বে, আর ঘুম থেকে সকালে উঠে কিসের প্রত্যাশাই বা করবে? এককালে ঐ কাপ্তেনের হিসাবমতে পৃথিবীতে দুটি মাত্র সত্য ছিল,—কথায় কথায় সে একবার বলতো এটা, একবার বলতো ওটা। তার একটা হচ্ছে এই যে, জীবনটা আশ্চর্য রকমের সুন্দর; আর একটা হচ্ছে এই যে, জীবনের কিছু বিশেষ উদ্দেশ্য আছে এ যারা বলতে চায় তারা পাগল। কিন্তু আজকাল সে মত উল্টে গেছে। এখন কাপ্তেন নিঃসংশয়ে এবং জোর গলায় বলতে থাকে যে সত্য এক এবং অদ্বিতীয়। ঐ একটি সত্য পৃথিবীতে চিরকাল ছিল, চিরকাল আছে, এবং চিরকাল থাকবে,—সেই চরম সত্যের কথা বলে গেছেন ইহুদের জব, আর বলেছেন যত ধর্মযাজকের দল এবং নানা দেশের মহাপুরুষরা। মদের দোকানে ব'সে কাপ্তেন প্রায়ই সকলকে শুনিয়ে শুনিয়ে তাই

বলে—"ভাই, যৌবন থাকতে তোমাদের সৃষ্টিকর্তাকে এই বেলা ভাল ক'রে চিনে নাও,—মন্দ সময় যখন পড়বে, দিন যখন ঘনিয়ে আসবে, যখন বলতে হবে যে জীবনে আর কোনো সুখ নেই, তার আগে থেকেই জীবনের আসল ব্যাপারটা বুঝে নাও।"

আগেকার দিনে আর এখনকার দিনে অনেক তফাৎ, কিন্তু তবু দিন আর রাত্রি আগের মতো তেমনি একভাবেই সমানে আসা যাওয়া করে। এই একটা রাত্রি পার হ'য়ে গেল, আবার সকাল হ'য়ে এসেছে। কাপ্তেন আর চ্যাং ঘুম থেকে এবার জেগেছে।

কিন্তু জেগেও কাপ্তেন চোখ খোলে না, কিংবা শয্যাত্যাগ করে না। চ্যাং বেচারা সমস্ত রাত্রি উনোনের ধারে শুয়ে ছিল, সারারাত সমুদ্রের ঠাণ্ডা বাতাস এসে তার গায়ে লেগেছে। কাপ্তেন শুয়ে শুয়ে এখন কি ভাবছে তা সে কিছুই জানে না। কিন্তু এটা সে জানে যে কাপ্তেন অন্তত আরো একঘণ্টা ঠিক ঐ ভাবেই চুপচাপ শুয়ে থাকবে। কাজেই আড়চোখে একবার দেখে নিয়ে আবার সে চোখ বোজে, আবার একটু ঘুমিয়ে পড়ে। চ্যাংও মাতাল; সকালে ঘুম থেকে উঠে সে পৃথিবীর দিকে চায় নিতান্ত ক্লান্ত চোখে, যেন সমুদ্রপীড়ায় কাতর সমুদ্রযাত্রীর মতো। তখনি আবার সে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আগেকার দিনের একটা বিশ্রী রকমের স্বপ্ন দেখতে থাকে।...

স্বপ্নের মধ্যে সে দেখে—

একটা বুড়ো ঘোলাচোখো চীনেম্যান এক মস্ত জাহাজের ডেকের ওপর উঠেছে, সেখানে উবু হ'য়ে বসেছে। এক ঝুড়ি পচা মাছ নিয়ে সে সকলকে কাকুতি-মিনতি করছে তাই কেনবার জন্যে। চীনদেশের একটা প্রকাণ্ড নদী, দিনটা মেঘলা। নদীর ঘোলা জলের ওপর একখানা পালতোলা পান্‌সি দুলছে, তাতে ব'সে আছে একটি ছোটো কুকুরছানা; তার রংটা বাদামী, গলার কাছে বড় বড় পশমঘেরা, দেখতে যেন খানিকটা শেয়ালের মতো, খানিকটা নেকড়ে বাঘের মতো; কান দুটো খাড়া ক'রে সে উৎসুক দৃষ্টিতে উঁচু জাহাজটার তলা থেকে উপর পর্যন্ত চেয়ে চেয়ে দেখছে।

"তোর কুকুরটা বেচবি?"—জাহাজের তরুণ কাপ্তেন এতক্ষণ চুপ ক'রে একপাশে দাঁড়িয়েছিল, সে কতকটা মুরুব্বিয়ানার সুরে চেঁচিয়ে বুড়ো চীনেম্যানকে এই ব'লে সম্বোধন করলে।

চ্যাংএর আদি মনিব সেই চীনেম্যান থতমত খেয়ে কাপ্তেনের দিকে চাইলে। কাপ্তেনকে চিনতে পেরে খুশি হ'য়ে সে বার বার সেলাম করতে লাগলো। "বড় ভাল কুকুর হুজুর, আপনি একে নিয়ে নিন, বড় ভাল কুকুর।" কুকুরটা এক টাকায় কেনা হ'য়ে গেল; তখনই তার নাম রাখা হোলো চ্যাং। পরের দিনই সে ঐ জাহাজে তার নতুন মনিবের সঙ্গে রাশিয়া যাত্রা

করলে। তারপর তিন সপ্তাহ কাল তার সমুদ্রপীড়ায় এমন কষ্ট হোলো যে সে একেবারে মড়ার মতো পড়ে রইলো, ভাল ক'রে সমুদ্রও দেখতে পেলে না, সিঙ্গাপুরও না, কলম্বোও না।...

চীন-সমুদ্রে তখন ভীষণ তুফান আরম্ভ হ'য়ে গেছে ; ঝড় দেখা দিয়েছে। সমুদ্রসঙ্গমে এসে পড়তে না পড়তেই চ্যাংএর গা মাথা টলতে লাগলো। যেমন বৃষ্টি তেমনি কুয়াশা ; জলের ওপর অসংখ্য ঢেউ, তার মাথায় সাদা সাদা ফেনার চূড়া ; ঘোলা-সবুজ জলের স্তম্ভগুলো নির্বোধের মতো অনর্থক দিগ্বিদিকে ফুলে ফেঁপে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে তেড়ে-ফুঁড়ে উঠতে লাগলো ; এদিকে জলের প্রসার ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে, যা-ও বা একটু কিনারা দেখা যেতো তাও কুয়াশায় ঢেকে গেছে। ওয়াটারপ্রুফ গায়ে টুপি মাথায় কাপ্তেন জাহাজের ব্রিজের ওপর দাঁড়িয়েছে, চ্যাংও তার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, বৃষ্টিতে তার গায়ের পশম ভিজে চক্ চক্ করছে। কাপ্তেন সেখানে দাঁড়িয়ে কাকে হুকুম দিচ্ছে, আর চ্যাং শীতে কাঁপছে, মধ্যে মধ্যে মাথা ঝাড়া দিচ্ছে। দিগন্ত-বিস্তারী জলের রাশি কুয়াশাচ্ছন্ন আকাশের সীমান্তের সঙ্গে এক হ'য়ে মিশে গেছে। ঝোড়ো হাওয়া ঝাপ্টা মেরে ঢেউয়ের মাথাগুলো চূর্ণ ক'রে দিগ্বিদিকে জলধারা ছিটিয়ে দিয়ে যাচ্ছে, কখনো বা মাস্তুলগুলোকে নাড়া দিয়ে সোঁ সোঁ শব্দে বাঁশী বাজাচ্ছে, কখনো বা বিপুল গর্জনে পালগুলোর গায়ে ধাক্কা

মেরে সেগুলো ফুলিয়ে দিচ্ছে ; খালাসীরা বর্ষাতি টুপি মাথায় দিয়ে তাড়াতাড়ি সেখানে গিয়ে পালের রশি খুলে দিচ্ছে। তখন আরো জেদ বেড়ে গিয়ে বাতাস যেন সুবিধা খুঁজতে লাগলো কোনখানে মারলে ধাক্কাটা সব চেয়ে জোরে লাগবে। যেমনি জাহাজ ডানদিকে একটু মোড় ফিরেছে, অমনি বাতাসে তাকে এক অত্যুচ্চ ঢেউয়ের মাথায় তুলে দিলে, সেখান থেকে নাবতে গিয়ে জাহাজের মাথাটা ফেনারাশির মধ্যে ডুবে গেল। ক্যাপ্তেনের কেবিনে টেবিলের ওপর একটা কফির পেয়ালা ছিল, সেটা হঠাৎ ঝন্‌ঝন্‌ শব্দে মেঝেয় প'ড়ে চুরমার হ'য়ে গেল।··· তার পরেই যা মজা শুরু হোলো—

তার পর থেকে দিন কাটতে লাগল নানা বৈচিত্র্যে। কোনো দিন বা প্রচণ্ড রৌদ্রে সমস্ত ঝল্‌সে যেতো ; কোনো দিন বা আকাশে মেঘ জমতো পাহাড়ের মতো, আর বজ্রনির্ঘোষে সমস্ত আকাশ ফেটে পড়তো ; কখনো বা বৃষ্টির মুষলধারে জাহাজ আর সমুদ্র একেবারে ভেসে যেতো, নোঙরে বাঁধা থাকলেও জাহাজখানা ক্রমাগত দুলতো। তিন সপ্তাহের মধ্যে চ্যাং একবারও মাথা তোলে নি ; সেকেণ্ড ক্লাস কেবিনগুলোর অন্ধকার গলি-পথের দরজার গোড়ায় কোনটিতে সে নিস্তেজ হ'য়ে পড়ে থাকতো। দিনান্তে এই দরজাটি একবার খুলতো, ক্যাপ্তেনের চাকর তখন তার খাবার দিয়ে যেতো।···রেড্‌ সি-তে এই সমুদ্রযাত্রা সম্বন্ধে ভাবতে গেলেই এখন তার কেবল মনে

পড়ে জাহাজের কাঠগুলো চড়্‌চড়্‌ শব্দ করছে, তার ক্রমাগতই গা বমি করছে, বুকের ভেতর যেন তোলপাড় করছে, আর জাহাজখানা বারে বারে পাতালের নীচে তলিয়ে গিয়ে আবার যেন স্বর্গে উঠে যাচ্ছে ; আরও মনে পড়ে জাহাজের গায়ে ঢেউএর ধাক্কা লেগে কামানের মতো এক একটা প্রচণ্ড শব্দ হচ্ছে, আর ভয়ে তার সমস্ত গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে ; জাহাজের পিছনটা এক একবার শূন্যে উঠে পড়ছে আর তার চাকাটা সঙ্গে সঙ্গে গর্জ্জন ক'রে উঠছে ; জলের ঝাপ্‌টা লেগে পোর্ট-হোলের গবাক্ষ ঝাপ্‌সা হ'য়ে যাচ্ছে, তার মোটা কাচের গা বেয়ে ছাটের জল ভিতরে গড়িয়ে পড়ছে। চ্যাং শুয়ে শুয়ে শুনছে কে যেন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কি হুকুম দিচ্ছে, তীব্র স্বরে একটা বাঁশী বেজে উঠলো, মাথার উপরের ডেক দিয়ে কয়েকজন খালাসী দুপ্‌ দুপ্‌ শব্দ ক'রে দৌড়ে গেল ; ঝপাং ক'রে জলের উপর একটা কি পড়ে যাবার শব্দ হোলো। অর্দ্ধ-নিমীলিত চক্ষে চ্যাং দেখতে পাচ্ছে সমস্ত গলিপথটা বড় বড় চাএর বস্তায় ভরা,—গরমে আর চাএর গন্ধে চ্যাংএর গা পাক দিতে লাগলো, মাতালের মতো সে অজ্ঞান হ'য়ে পড়লো—

এইখানে হঠাৎ ওর স্বপ্ন ভেঙে গেল।

চম্‌কে উঠে চ্যাং চোখ মেলে চাইলে। কোথায় সমুদ্র ? কামানের মতো যে শব্দটা হয়েছিল সেটা বস্তুত জলের শব্দ নয়,—বাসাবাড়িটার নীচে কোথায় কে একজন সজোরে ধাক্কা

মেরে কপাট খুললে। কাপ্তেন একবার কেসে গলাটা পরিষ্কার ক'রে নিয়ে বিছানায় উঠে বসলো, ছেঁড়া জুতোটা পায়ে দিয়ে তার ফিতেগুলো টেনে বাঁধলে, বালিশের তলা থেকে কোট বের ক'রে নিয়ে তাতে পিতলের বোতামগুলো লাগালে; এই দেখে চ্যাংও হাই তুলে একটা আলস্যজড়িত শব্দ করলে, তারপর আড়মোড়া ভেঙে দাঁড়িয়ে উঠলো। দেরাজের ওপর একটা বোতলে খানিকটা ভড্‌কা ছিল, কাপ্তেন তার থেকে চুমুক দিয়ে কতক খেয়ে ফেললে, তারপর মুখ মুছে চ্যাংএর কাছে গিয়ে একটা বাটিতে তার জন্যেও একটু ঢেলে দিলে। এক নিমেষে চ্যাং সেটুকু চেটে শেষ ক'রে ফেললে। কাপ্তেন একটা সিগারেট ধরিয়ে আবার বিছানায় গিয়ে শুলো, আরো একটু বেলা হ'লে তবে উঠবে। রাস্তায় ট্রাম চলার শব্দ আরম্ভ হ'য়ে গেছে, অনেকগুলো ঘোড়ার খুরের শব্দ শোনা যাচ্ছে, কিন্তু কাপ্তেনের বেরোবার সময় হয়নি এখনও। সে শুয়ে শুয়ে সিগারেট টানছে। ভড্‌কা চেটে নিঃশেষ ক'রে চ্যাং মনিবের বিছানার ওপর লাফিয়ে উঠলো, ল্যাজ নাড়তে নাড়তে কাপ্তেনের পায়ের কাছে কুণ্ডলি হ'য়ে শুলো, তারপর ভড্‌কার নেশায় ভেসে চলল কোন আনন্দলোকে। চোখ দুটো প্রায় নিমীলিত ক'রে প্রভুর মূর্তিটা অস্পষ্ট দেখতে দেখতে তার প্রভুভক্তি অন্তরে অন্তরে আবেগময়ী হ'য়ে উঠলো; সেই মনের ভাবটা যদি মানুষের ভাষায় প্রকাশ করা যায় তাহ'লে তার অর্থ এই রকম

হয়—"ওরে, তোরা অতি বোকা, অতি বোকা। পৃথিবীতে কেবল একটি মাত্র সত্য আছে, সে কেবল আমিই জানি,—যদি তোরা জানতিস্ কী চমৎকার সে জিনিস!"

স্বপ্ন-জাগরণের মধ্য দিয়ে আবার সে আগেকার দিনে ফিরে গেল, জাহাজটা যখন উদ্বেল সমুদ্র পার হ'য়ে রেড্ সি-তে গিয়ে পড়েছে···

আবার স্বপ্ন চলতে থাকে—

পেরিম পার হবার পর জাহাজের দোলা অনেক কমে গেছে, চ্যাং সুস্থ হ'য়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। হঠাৎ চম্‌কে উঠে তার ঘুম ভাঙলো। জেগে উঠেই সে একেবারে অবাক হ'য়ে দেখলে কোথাও আর গোলমাল নেই, জাহাজের চাকা বেশ সমান তালে ঘুরছে, জলের মৃদু কলসঙ্গীত মাত্র শোনা যাচ্ছে। রান্নাঘর থেকে একটা চমৎকার রান্নার গন্ধ আসছে···চ্যাং উঠে বসে কেবিনের ভিতর থেকে চেয়ে দেখলে,—বাইরে দূর আকাশের গায়ে একটা সিঁদুরের মতো লাল আলোর আভাস, সবটুকু দেখতে না পেয়েও তার মনটা আনন্দিত হ'য়ে উঠলো; পোর্ট-হোলের ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে সমুদ্রের নীল জল আর বিস্তৃত আকাশ, গবাক্ষ পথে সুন্দর হাওয়া আসছে, আলোর রশ্মি এসে আয়নার ওপর পড়ছে, তার থেকে আলো বিচ্ছুরিত হ'য়ে দেয়ালের গায়ে লেগে কাঁপছে। আলোক-রশ্মিগুলো একই জায়গায় দাঁড়িয়ে কাঁপছে, কোথাও সরে যাচ্ছে না···

এমনি দিনে কাপ্তেনের যে রকম ভাবের উচ্ছাস দেখা দিত, ঐ সময় চ্যাংএর মনেও সেই রকম ভাবের উদয় হয়েছে। হঠাৎ সে আবিষ্কার করে ফেললে যে জগতে কেবল একটি মাত্র সত্য নেই, সত্য আছে দুটি; একটি হচ্ছে এই যে পৃথিবীতে জন্ম নিলেই যদি এমনিভাবে জাহাজে চড়তে হয় তো পৃথিবীটা সত্যিই বড় মারাত্মক জায়গা; আর একটি হচ্ছে···কিন্তু সে কথা ভাববার আর ফুরসৎ হোলো না, হঠাৎ একদিককার দরজা খুলে গেল, কাপ্তেন সিঁড়ি বেয়ে জাহাজের এঞ্জিন-ঘর থেকে উপরে উঠে এলো। কাপ্তেনের ইতিমধ্যে দাড়ি কামানো ও স্নান করা হ'য়ে গেছে; তার গা থেকে ভুর্‌ভুর্ ক'রে ওডিকলোনের টাটকা গন্ধ বেরুচ্ছে, গোঁফটা জার্মানদের মতো পাকিয়ে দুদিকে ছুঁচোলো ক'রে তুলে দেওয়া হয়েছে; তার চোখের দৃষ্টি অতি উজ্জ্বল, সদ্যপরিহিত পোষাক একেবারে ফিট্‌ফাট্, তুষারের মতো শুভ্র। মনিবকে দেখে চ্যাং খুশি হ'য়ে তার গায়ে ঝাঁপিয়ে উঠলো, কাপ্তেন তখনই তাকে তুলে ধরে কপালে একটি চুম্বন দিলে, তার পর তাকে কোলে নিয়ে দুই তিন লাফে নীচের ডেকে গেল, সেখান থেকে গেল উপরের ডেকে, সেখান থেকে আরো উপরে সেই ব্রিজে গিয়ে উপস্থিত হোলো।

কাপ্তেন যখন ওকে নামিয়ে দিয়ে পাইলটের ঘরে গিয়ে ঢুকলো, চ্যাং তখন সেই ঘরের বাইরে ল্যাজটি পেতে বসলো।

সেখানে সকাল থেকেই রৌদ্রের বড় ঝাঁজ। যেখান দিয়ে জাহাজ চলেছে তার পাশেই আরব দেশ, সেখানেও নিশ্চয় প্রচণ্ড গরম। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে আরব্য পর্বতমালা, যেন কোনো উপগ্রহের ভিতরকার পর্বতশ্রেণীর মতো, তার গায়ে গায়ে কত স্বর্ণরেণু ছড়ানো,—এ সব এতই কাছে দেখা যাচ্ছে যেন মনে হয় জাহাজ থেকে এক লাফ দিলেই সেখানে পেঁছানো যায়। ব্রিজের ওপর এখনো ভোরের হাওয়ার আমেজ কিছু পাওয়া যায়, এখনো এক একবার ঠাণ্ডা হাওয়াতে গা জুড়িয়ে যায়; কাপ্তেনের একজন মেট্—যে লোকটা তামাসা ক'রে চ্যাংএর নাকের মধ্যে ফুঁ দিয়ে কখনো কখনো তাকে ভয়ানক রাগিয়ে দিতো—সে খুব ধব্ধবে পোষাকে সাদা টুপি মাথায় দিয়ে আর কালো ফ্রেমের মোটা চশমা প'রে ব্রিজের ওপর দ্রুত পায়চারী ক'রে বেড়াচ্ছে, এবং বার বার জাহাজের মাস্তুলটার ডগার দিকে চাইছে, সেখানে আকাশের গায়ে সামান্য একটু মেঘ দেখা যাচ্ছে···

কাপ্তেন ঘরের ভিতর থেকে ডাক দিলে—"চ্যাং এদিকে আয়, একটু কাফি খেয়ে যা!" চ্যাং অমনি একলাফে পিতলের দরজা পার হ'য়ে ভিতরে ঢুকলো। ব্রিজের চেয়ে এ জায়গাটা আরো ভাল। সেখানে চামড়া-বাঁধানো সুন্দর একটা চওড়া বসবার জায়গা আছে, সেটা কাঠের দেয়ালের সঙ্গে একেবারে গাঁথা; ওরই উপরে দেয়ালের গায়ে একটা ঘড়ি টাঙানো আছে,

তার পালিশ-করা পিতল আর কাচগুলো সর্বদা ঝক্‌ঝক্ করছে। মেঝের উপর একটা বাটিতে দুধের সঙ্গে রুটি মাখানো রয়েছে। চ্যাং পরম আগ্রহে সেটি চেটে খেতে লাগলো, কাপ্তেন তখন খুশি হ'য়ে আপনার কাজ করতে লাগলো। জানলার ধারে টেবিলের ওপর একখানা ম্যাপ খুলে রেখে একটা মোটা রুল দিয়ে তার ওপর লাল-কালির লাইন টানতে যতক্ষণ সে ব্যস্ত, ততক্ষণে চ্যাং সমস্ত খেয়ে ফেলেছে, তার ঠোঁটে দুধের সাদা দাগ লেগে গেছে,—সে ঐ জানলার ধারে লাফ মেরে উঠে দেখতে পেলে নীল পোষাক পরা একজন খালাসী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হ্যাণ্ডেল দেওয়া একটা চাকা ঘোরাচ্ছে। কাপ্তেন তখন চ্যাংকে কাছে ডেকে গল্প শুরু ক'রে দিলে; কেউ যখন কাপ্তেনের ঘরে থাকত না, তখনই কাপ্তেন ওর সঙ্গে নানারকম গল্প করতো আর নিজের মনের কথাগুলি ওর কাছে সব বলে ফেলতো।

কাপ্তেন বললে—"বুঝলে চ্যাং, যেখান দিয়ে আমরা এখন যাচ্ছি সেটা হচ্ছে রেড্ সি। দেখছো জলের কেমন সুন্দর রং,—কিন্তু এখান দিয়ে আমাদের খুব সাবধানে যেতে হবে। ওডেসাতে যখন পৌঁছবো তখন তোমার চেহারাটা কিন্তু খুব সুশ্রী দেখানো দরকার, সেখানে যারা রয়েছে তারা ইতিমধ্যেই তোমার পরিচয় সব জেনে গেছে। যে মেয়েটির কাছে আমি তোমার চেহারার অনেক সুখ্যাতি ক'রে লিখেছি, সে ভারী খুঁৎখুঁতে মেয়ে; খবরটা তারযোগে পাঠিয়েছি,—আজকাল বুদ্ধিমান মানুষ-জাতি

এইরকম তাড়াতাড়ি খবর পাঠাবার জন্যে সমুদ্রের তলা দিয়ে অনেক তার পেতে রেখেছে, বুঝেছ কিনা···যাই হোক চ্যাং, আমার কপালটা এখন ভালই বলতে হবে, জাহাজের কাপ্তেনি নিয়ে এই আমার প্রথম লম্বা পাড়ি, এখন হঠাৎ জাহাজটা কোথাও ঠেকে গিয়ে আমার বদনাম না হ'য়ে যায়···"

কথা বলতে বলতে কাপ্তেন থেমে গিয়ে হঠাৎ চোখ রাঙিয়ে চ্যাংএর গালে এক চড় মেরে বললে—"পা নামিয়ে নে; গবর্ণমেণ্টের আসবাবে ময়লা পা তুলে নোংরা ক'রে দেওয়া?"

চড় খেয়ে চ্যাং মাথাটা সরিয়ে নিয়ে গোঁ গোঁ ক'রে উঠলো, অপমানে তার মুখের চামড়া কুঁচকে গেল। জীবনে এই প্রথম সে মনিবের কাছে মার খেলে, তার মনে বড় আঘাত লাগলো। আবার তার বোধ হ'তে লাগল যে এই পৃথিবীতে জন্মানোই খারাপ, আর জাহাজে চড়ে সর্বদা সমুদ্রপথে ঘোরা আরো খারাপ। মুখটা সে ঘুরিয়ে নিলে, সঙ্কুচিত চোখ দুটো নিতান্ত নিষ্প্রভ হ'য়ে গেল, অভিমানে গোঁগোঁ করতে করতে তার দাঁত বেরিয়ে পড়লো। কিন্তু কাপ্তেন ঐ বিষয়ে আর কোনো গ্রাহ্যই করলে না। নতুন একটা সিগারেট ধরিয়ে সে টেবিলের দিকে ফিরলো; পকেট থেকে একটা সোনার ঘড়ি বের ক'রে তার পিছনের ঢাকনিটা খুলে ফেললে, তার ভিতর দেখা গেল একটা চক্‌চকে চাকা খুব চঞ্চল হ'য়ে ঘুরছে, ঘড়ির ভিতর থেকে অনবরত একটা মৃদু গুঞ্জনের শব্দ হচ্ছে; ঘড়িটার দিকে চেয়ে কাপ্তেন আবার

আগের মতো সহজভাবে তার সঙ্গে কথা বলা শুরু ক'রে দিলে। তাকে বিশেষ ক'রে জানিয়ে দিলে যে জাহাজ থেকে নামলে এবার যেতে হবে ওডেসা শহরে সেই এলিসাবেথিন্স্কায়া ষ্ট্রীটে, যেহেতু প্রথমত ঐ ষ্ট্রীটেই হচ্ছে তার বাসা, দ্বিতীয়ত সেখানে আছে তার সুন্দরী স্ত্রী, আর তৃতীয়ত সেখানে থাকে তার সেই চমৎকার মেয়েটি ; সুতরাং মোটের উপর বুঝে নিতে হবে যে বক্তা হচ্ছেন স্বয়ং একটি ভাগ্যবান পুরুষ।

কাপ্তেন নিজের মনে বলতে লাগলো—"আমি হচ্ছি একজন ভাগ্যবান পুরুষ, বুঝলে চ্যাং ? আমার সেই মেয়েটি, যার কথা এতক্ষণ বলছিলাম, সে এক অদ্ভুত মেয়ে, যা ধরবে তাই করবে, বুঝলে চ্যাং ?—তোমার মাঝে মাঝে তাকে নিয়ে ভারী বিপদ হবে, ল্যাজটা তোমার বাঁচানোই হয়তো দায় হ'য়ে উঠবে। কিন্তু কী চমৎকার মেয়ে তা যদি তুমি একবার দেখ চ্যাং! আমি তাকে এত বেশি ভালবাসি যে মাঝে মাঝে আমার সেজন্যে ভয় হয় ; আমার জীবনে সে ছাড়া যেন আর কিছু নেই, কিন্তু এতটা বাড়াবাড়ি তো ঠিক নয়! কাউকেই এত বেশি ভালবাসাটা উচিত নয়, কি বল ? বুদ্ধ-টুদ্ধ মহাপুরুষরা ধরো যে সব কথা বলে গেছে,—তারা কি আর তোমার-আমার চেয়ে বোকা ছিল ? তারা বলে গেছে যে সমস্তই হচ্ছে মোহ, পৃথিবীর যা-কিছু তুমি ভালবাসো,—আলো বলো, ঢেউ বলো, বাতাস বলো, স্ত্রীলোক বলো, শিশু বলো, আর জুঁই ফুলের গন্ধই বলো।

তোমাদের দেশের চীনারা যে তাও-এর কথা বলে, তার আসল মানেটা কি জান? আমিও অবশ্য ভালরকম জানি না, কিন্তু সকলের ধারণাই প্রায় ঐ একই রকম; তা যতটুকু জানি, ওর ভেতরকার মোট কথাটা তো সেই একই? বিরাট একটা শূন্য,—সেই শূন্যই হচ্ছে আমাদের আদি জননী; যা কিছু পৃথিবীতে দেখছো সমস্তই সেই শূন্যের গহ্বর থেকে জন্মায়, আবার তাও-জননী সমস্তই শূন্যের মধ্যে গ্রাস করে, ফের বারেবারে সমস্তই নতুন ক'রে জন্ম দিতে থাকে। অনবরত এই চলেছে। কিংবা আর এক কথাও বলা যায় যে, পথ আছে সেই একটি মাত্র, সে পথ থেকে কারো গত্যন্তর নেই। তবু নিয়তই আমরা ভুল ক'রে পথ ছেড়ে বিপথে যেতে চাই। কেবল যে সুন্দরী স্ত্রীলোকটিকেই পেতে চাই তা নয়, তারপরে আরো কত রকম কি চাই, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকেই আমরা পেতে চাই। এই পৃথিবীতে বাস করা মহা যন্ত্রণা, বুঝলে চ্যাং? এখানে সুখও যথেষ্ট আছে বটে, কিন্তু কষ্টও আছে যথেষ্ট, বিশেষত আমার মতো লোকের পক্ষে। আমি সুখটিই কেবল খুঁজে বেড়াই, সেই জন্যে কেবলই সোজা পথ হারিয়ে ফেলি। মনে হয় এই চলবার পথটা কেবলই বুঝি অন্ধকার,—কিন্তু আসলে হয়তো তার সম্পূর্ণ বিপরীত, তাই বা কে জানে?"

একটু চুপ ক'রে কাপ্তেন আবার বলতে লাগলো—"কিন্তু এদিকে আবার আসল মজাটা কোথায় জানো? যদি তুমি

কাউকে ভালবাসলে,—তাহ'লে দুনিয়ায় এমন কোনো শক্তি নেই যা তোমাকে বিশ্বাস করাতে পারবে যে, তুমি যতই যা করো, সে হয়তো তোমায় মোটেই ভালবাসছে না, তুমিই শুধু মরছো তার জন্যে। এখানেই সয়তানের খেলা, বুঝলে চ্যাং? তবু তা সত্ত্বেও জীবনটা মোটের উপর কী বিরাট ব্যাপার বল তো!"

বেলা প্রখর হলো, রৌদ্রতাপে দগ্ধ হ'য়ে জাহাজ বিশাল রেড্-সির উপর দিয়ে দুলতে দুলতে চলেছে। উত্তপ্ত আকাশ প্রখর চোখে কেবিনের দরজা দিয়ে উঁকি মারছে। মধ্যাহ্ন হ'য়ে এসেছে, জাহাজের পিতলের সরঞ্জামগুলো রৌদ্রকিরণে জ্বলছে; জলের উপর রৌদ্রকিরণ পড়ে চোখ ঠিকরে দিচ্ছে, তার প্রতিফলিত রশ্মি তির্যকভাবে এসে কেবিনের মধ্যে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। চ্যাং বেঞ্চের উপর বসে কাপ্তেনের কথা শুনছিল। কাপ্তেন তার মাথায় হাত বুলিয়ে তাকে বেঞ্চ থেকে নামিয়ে দিলে—"নীচে নেমে বোস, এখানটা ভয়ানক গরম।" চ্যাংএর এখন আর এ কথায় রাগ হলো না, এই মধ্যাহ্নেও পৃথিবীটাকে তার খুব ভালই লাগছিল। তারপর—

হঠাৎ স্বপ্নে বাধা পড়লো।

"এবার উঠে পড়্ চ্যাং"—ব'লে কাপ্তেন বিছানা থেকে পা নামিয়ে বসলো। বিস্মিত হ'য়ে চ্যাং চোখ খুলে দেখলে রেড্

সি-তে জাহাজের উপর নয়, সে এখন ওডেসা শহরে একটা ছোট কুঠরির মধ্যে রয়েছে; সময়টা মধ্যাহ্নই বটে কিন্তু সে রকম চমৎকার মধ্যাহ্ন নয়, বন্ধ ঘরের মধ্যে একটা বিশ্রী গুমোট অন্ধকার;—কাপ্তেন তার সেই উজ্জ্বল সুখের স্বপ্নটা ভেঙে দিয়েছে ব'লে সে অসন্তুষ্ট হ'য়ে গোঁ গোঁ ক'রে উঠলো। কাপ্তেন উঠে আপন মনে তার সেকেলে কাপ্তেনি টুপিটা মাথায় দিলে, পুরানো ওভারকোটটা পরলে, তারপর পকেটে হাত দুটো ঢুকিয়ে দিয়ে কুঁজো হ'য়ে বেরিয়ে চললো। অগত্যা তখন চাংকেও বিছানা থেকে তাড়াতাড়ি নামতে হোলো। সিঁড়ি দিয়ে নামা-ওঠা এখন কাপ্তেনের পক্ষে কঠিন, নিতান্ত প্রয়োজন ব'লেই অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে নীচে যাচ্ছে। অগ্রসর হ'য়ে চ্যাং একটু তাড়াতাড়ি নেবে গেল,—ভড্‌কার নেশাটা ছেড়ে যাওয়াতে তার মেজাজটা বিগ্‌ড়ে গেছে।...

আজ দুবছর হ'তে চলল কাপ্তেন আর চ্যাং প্রত্যহ সকালে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে যায় কোনো-না-কোনো রেস্তোরাঁতে। সেখানে গিয়ে তারা দুজনেই একসঙ্গে মদ্যপান করে। পাশে বসে পান করে কত রকমের মাতাল, আর চারিদিকে কেবল গোলমাল, চুরুটের ধোঁয়া, নানা রকমের বদ গন্ধ। চ্যাং কাপ্তেনের পায়ের কাছটিতে শুয়ে থাকে। টেবিলের উপর দুই কনুই রেখে কাপ্তেন বসে বসে চুরুট ফোঁকে, এ অভ্যাসটা তার জাহাজ থেকেই

আছে। এখান থেকে উঠে আবার অন্য একটা হোটেলে কিংবা কাফিখানায় গিয়ে পেট ভরাবার খাদ্য খাবার জন্যে সে অপেক্ষা ক'রে বসে থাকে, কখন সেই সময় হবে মনে মনে তার একটা আন্দাজ ওর আছে। কাপ্তেন আর চ্যাং ব্রেকফাষ্ট খায় এক জায়গায়, মদ খায় অন্য জায়গায়, কাফি খায় অন্য জায়গায়, ডিনার খায় অন্য জায়গায়। যে হোটেলেই যাক, কাপ্তেন এখন সর্বদা প্রায় চুপ ক'রেই বসে থাকে। কিন্তু এক এক দিন বন্ধু জুটে যায়, তখন অনবরত সে বকতেই থাকে, কেবলই বলে জীবনটা নিতান্ত অসার, আর মিনিটে মিনিটে মদ ঢালে; সেই মদ একবার নিজে খায়, একবার বন্ধুকে দেয়, একবার দেয় চ্যাংকে,—তার জন্যে একটা স্বতন্ত্র পাত্র আছে। আজকের দিনটা এমনি ভাবেই কাটবে; একজন পুরানো বন্ধুর সঙ্গে তাদের খাবার কথা আছে, সে একজন আর্টিষ্ট, মাথায় লম্বা সিল্কের টুপি পরে। চ্যাং বেশ জানে, প্রথমে ওরা যাবে একটা সস্তা বিয়ারের দোকানে,—সেখানে থাকে যত লালমুখো জার্মানের দল, তারা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পরিশ্রম করে কেবল এই খাদ্য-পানীয়েরই জন্যে; তারা কেবল খাটে, আর খায়, আর তাদেরই মতো আরো কত লালমুখো মানুষের জন্ম দেয়। ওখান থেকে বিয়ার খেয়ে যাবে এরা এক কাফিখানায়, সেখানে যত গ্রীক আর ইহুদি। তাদেরও জীবন এমনি অর্থহীন, তারা কেবল ষ্টক-এক্সচেঞ্জের দরের খবর জানবার জন্যেই সর্বদা ব্যস্ত, ঐ নিয়েই

তাদের অস্তিত্ব। সেখান থেকে এরা যাবে অন্য এক রেস্তোরাঁতে, সেখানে আবার অন্যান্য রকম লোকের ভীড়। ঐখানে খেতে গিয়ে থাকতে হবে অনেক রাত পর্যন্ত।...

শীতের দিন একেই তো ছোটো, তার উপর পাশে যদি থাকে মদের বোতল, আর থাকে একটি অন্তরঙ্গ বন্ধু, তাহ'লে দিনটা যেন দেখতে দেখতেই কেটে যায়। কাপ্তেন এবং চ্যাং এবং সেই আর্টিষ্ট, তিনজনে মিলে বিয়ারের দোকান আর কাফি-খানা ঘুরে এসে একটা রেস্তোরাঁতে বসে খাওয়া-দাওয়া করছে, ইতিমধ্যে ছয় ঘণ্টা সময় কখন পার হ'য়ে গেছে। কাপ্তেন আবার তেমনি ক'রে টেবিলের উপর দুই কনুই রেখে বন্ধুকে প্রাণপণে বোঝাতে চেষ্টা করছে যে পৃথিবীতে আছে শুধু একটি মাত্র সত্য,—আর সেটা অতি জঘন্য সত্য। উত্তেজিত হ'য়ে অনর্গল সে বলে যাচ্ছে—"একবার শুধু চারদিকে নজর দিয়ে চেয়ে দেখ,—ঐ বিয়ারের দোকানে, ঐ কাফিখানায়, এই পথে ঘাটে যে সব মানুষকে আমরা নিত্যই দেখছি তাদের ভিতরে কী বস্তু আছে সেইটে একবার মনে ক'রে দেখ। বন্ধু, আমি সমস্ত পৃথিবীটা ঘুরে দেখেছি,—মানুষ সব জায়গাতেই সমান। জীবনের যে রকম মোলায়েম অভিনয় তারা দেখায় তার সমস্তই ভান মাত্র, সমস্তই মিথ্যা ; আসলে তাদের না আছে ভগবান, না আছে কিছু জ্ঞান-চৈতন্য, না আছে জীবনের কোনো উদ্দেশ্য, না আছে প্রেম, না আছে প্রীতি, না আছে সাধুতা,—বেশি কথা

কি, ভিতরে সামান্য দয়ামায়াটুকু পর্যন্ত নেই। মানুষের জীবনটা ঠিক কি রকম জানো,—যেন কুয়াশাচ্ছন্ন শীতের মাত্র কয়েকটা দিন নোংরা এক সরাইখানার মধ্যে মাথা গুঁজে কোনোমতে কাটিয়ে দিয়ে যাওয়া, আর কিছু না·····"

চ্যাং টেবিলের নীচে শুয়ে শুয়ে তন্দ্রার ঘোরে এইসব শুনছে। কাপ্তেনের সব কথার সে সমর্থন করে কি না কে জানে? ঠিক ক'রে নিজের স্বাধীন মতটা ব্যক্ত করা তার পক্ষে অসম্ভব,—আর তা অসম্ভব ব'লেই যত কিছু গোলমাল। চ্যাং নিজেই বুঝতে পারে না যে কাপ্তেনের কথা সত্য কিনা। এ তো কেবল দুঃখের দিন এলেই আমরা বলে থাকি—"কিছু জানি না, কিছু বুঝতে পারি না"; আবার যখন সুখের দিন আসে তখন সবাই মনে করে, আমরা সব জানি, সব বুঝি।···হঠাৎ তার চিন্তা এবং তন্দ্রার অন্ধকারের মধ্যে কোথা থেকে কেমন একটা আলোকরশ্মি ফুটে উঠলো; হঠাৎ বেজে উঠলো রেস্তোরাঁর ব্যাণ্ড,—প্রথমে বাজলো একটা সুমিষ্ট বেহালার সুর, তারপর আর একটা, তারপর আর একটা···ঐক্যতান সঙ্গীতের শব্দে সমস্ত আকাশ বাতাস ভরে গেল,—চ্যাংএর অন্তরাত্মা এক অদ্ভুত বিষণ্ণতার সমুদ্রে যেন ডুবে গেল, অদ্ভুত রকমের একটা উদ্বেগে সে আকুল হ'য়ে উঠলো। কি এক অজানিত আনন্দে তার প্রাণের ভিতরটা থর্‌থর্ ক'রে কাঁপতে লাগলো,—কাতর হোলো কি এক অব্যক্ত করুণ বেদনায়, যেন কোথায় কোন অনির্দিষ্ট

সামগ্রীর সে নাগাল পেতে চাইছে,—চ্যাং তখন আর বুঝতে পারে না সে জেগে আছে না স্বপ্ন দেখছে। সঙ্গীতের সুরে সুরে সে তার সমস্ত প্রাণ ঢেলে দিয়ে ভেসে চলেছে সুরময় এক স্বতন্ত্র জগতে,—সে এক বিচিত্র আনন্দের জগতের সীমান্তে এসে উপস্থিত হয়েছে; এই বিশ্বজগৎকে তখন আবার মনে হয় অতি সুন্দর, আবার তার মনে পড়ে সেই কুকুরছানা জাহাজে যেন রেড্ সি পার হ'য়ে চলেছে…

বাজনা শুনতে শুনতে কতকটা সে কল্পনায় ভেবে নেয়, কতকটা আবার স্বপ্ন দেখে—

কেমন দিন তখন ছিল? মনে পড়েছে; রেড্ সি-তে জাহাজের ওপর সেদিনের সেই তপ্ত মধ্যাহ্নটা, বড়ই ভাল লেগেছিল…

চ্যাং আর কাপ্তেন কিছুক্ষণ পর্যন্ত ছিল পাইলটের গোল-ঘরে, তারপর সেখান থেকে চলে যায় ব্রিজের ওপর,—সেখানে কি উজ্জ্বল আলো! সমুদ্রের কি নীল জল, আকাশের কি আস্‌মানি সবুজ রঙ্! জাহাজের রেলিংএ শুকোচ্ছে নাবিকদের পোষাক, সাদা, লাল, হলদে,—রংগুলো কি চমৎকার বাহার দিয়ে ফুটে উঠেছে! ব্রিজ থেকে চ্যাং আর কাপ্তেন নেমে গেল ফার্স্ট ক্লাসের খানা-খাবার ঘরে, জাহাজের অন্যান্য লোকেরা তাদের সঙ্গে এসে যোগ দিলে,—পরিশ্রমে তাদের মুখ লাল, চোখ তৈলাক্ত, কপালে ঘামের বিন্দু। সেখানে তারা সকলে মিলে খাবার খেতে

লাগলো, আর এক পাশের ভেণ্টিলেটারের ফাঁক দিয়ে হু হু ক'রে হাওয়া ব'য়ে আসতে লাগলো। খাবার পর চ্যাং একচোট নিদ্রা দিলে। তারপর হোলো চা পান, তারপর হোলো ডিনার, তার পর আবার সে কাপ্তেনের সঙ্গে চলে গেল উপর তলায়। সেখানে একজন চাকর এসে কাপ্তেনের জন্যে রেলিংএর ধারে একটা ক্যাম্বিসের চেয়ার পেতে দিয়ে গেল। সেখানে বসে সে চেয়ে রইলো সমুদ্রের দিকে; চেয়ে রইলো সে সূর্যাস্তের আকাশের পানে, যেখানে বিচিত্র বর্ণের বিচিত্র আকারের খণ্ড খণ্ড মেঘের মধ্যে একটি সবুজ আভা অত্যন্ত স্নিগ্ধ হ'য়ে দেখা দিয়েছে। তীব্রচ্ছটাবিহীন ঘোর হিঙ্গুলবর্ণ অস্তগামী সূর্য যেখানে কৃষ্ণ দিগন্তের প্রান্তসীমায় গিয়ে ঠেকেছে, এবং সেখানে ঠেকেই লম্বাটে হ'য়ে লাল একখানা টুপির আকার নিয়েছে,—জাহাজ দ্রুতবেগে ছুটে চলেছে যেন সেই দিগন্তের উদ্দেশে। দুইপাশের জলরাশি সেই লাল আলোতে চক্ চক্ করছে, নীল জলের মধ্যে যেন লাল গোলাপের রং ভেসে ভেসে উঠছে। সূর্য ক্রমশ ডুবে চলেছে, সমুদ্র যেন তাকে গ্রাস ক'রে নিচ্ছে,—ক্ষয় হ'তে হ'তে একটা লম্বা অগ্নিরেখার মতো হ'য়ে কাঁপতে কাঁপতে সেটুকুও হঠাৎ গেল ডুবে। তখনই যেন একটা বিষণ্ণতার ছায়া পড়লো সমস্ত বিশ্বের উপর, বাতাস আরো এলোমেলো বইতে শুরু হোলো। কাপ্তেন একদৃষ্টে চেয়েছিল সেই সূর্যাস্তের দিকে। তার মাথা অনাবৃত, চুলগুলো বাতাসে

উড়ছে, মুখে একটা চিন্তান্বিত গর্বিত অথচ বিমর্ষ ভাব। চিন্তা তার যাই থাক, সে নিশ্চয় তখন মনে মনে জেনেছিল যে তবুও সে সুখী ; কেবল এই জাহাজটুকু নয়, সমস্ত বিশ্বই তার অধীনস্থ। এই বিশ্ব আর কতটুকুই বা, নিজেব অন্তরের মধ্যেই যেন তা ধরা যায়,—মদের গন্ধ তার মুখে তখন ভুর ভুব্ করছে—

তারপর এলো সেই রাত্রি,—সে এক সুদীর্ঘ থম্‌থমে রাত্রি। অত্যন্ত কালো, অতিশয় ভয়াবহ, বাতাস বইছে অতি প্রচণ্ডবেগে, ঢেউয়ের মাথায় হঠাৎ এমন এক একটা আলো জ্বলে উঠছে যে কাপ্তেনের পায়ে পায়ে চলতে চলতে চ্যাং তাই দেখে চম্‌কে ভয় পেয়ে রেলিংএর ধার থেকে পিছিয়ে যাচ্ছে। কাপ্তেন তখন ওকে কোলে তুলে নিয়ে ওর মাথাটা রাখলে তার বুকের কাছে—ওর বুকটা যেমন ধুক্‌ধুক্ শব্দ করছে কাপ্তেনের বুকেও ঠিক তেমনি ধুক্‌ধুক্ শব্দ। ওকে কোলে নিয়ে কাপ্তেন ডেকের শেষ প্রান্তে চলে গেল, সেখানে অনেকক্ষণ পর্যন্ত অন্ধকারের মধ্যে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো। সেখানে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখে চ্যাং চমৎকৃত হ'য়ে গেল। জাহাজের পিছনের প্রকাণ্ড চাকাটা সশব্দে অনবরত ঘুরছে, আর তার গা থেকে অসংখ্য জ্যোতিকণা উৎক্ষিপ্ত হ'য়ে ফুলঝুরির মতো ঝুর্‌ঝুর্ ক'রে ঝরে পড়ছে ; চাকার আলোড়নে জলের উপর একটা স্বচ্ছ পথরেখা কেটে জাহাজ এগিয়ে চলেছে, আর জ্যোতিকণাগুলো তারই মধ্যে পড়ে মুহূর্তের মধ্যে বিলীন হ'য়ে যাচ্ছে। কখনো বা সেখানে

নীল রংএর বড় বড় তারা কাটছে; কখনো বা এক-একটা সুবৃহৎ নীল জলপিণ্ড ভিতর থেকে ঠেলে উঠেই মুহূর্তমধ্যে কেটে চৌচীর হ'য়ে পড়ছে, সঙ্গে সঙ্গে একটা রহস্যজনক সবুজ বর্ণের স্ফুরজ্জ্যোতি সেই তরঙ্গাভিঘাতের মধ্যে বিকীর্ণ হচ্ছে। চারিদিক থেকে দমকা বাতাস এসে লাগছে চ্যাংএর গায়, গলার রোঁয়াগুলো ফাঁক হ'য়ে লোমকূপে পর্যন্ত বাতাস ঢুকছে,—তাইতে সে কেঁপে কেঁপে উঠছে। কাঁপতে কাঁপতে কাপ্তেনের বুকের ভিতর সে মুখ গুঁজে দিলে। সমুদ্রবক্ষ থেকে একটা ভিজে হাওয়া বয়ে এলো, তাতে যেন গন্ধকের মতো গন্ধ। জাহাজের চাকাটা কেঁপে কেঁপে ক্রমাগতই ঘুরতে লাগলো; কোন এক অদৃশ্য শক্তিতে সেটা জলের মধ্যে ক্রমাগতই ডুবে আবার ঘুরে ক্রমাগতই উপরে উঠতে লাগলো। চ্যাং উত্তেজিত হ'য়ে দেখতে লাগলো এই অন্ধ এবং অন্ধকারময় অতলজলের মধ্যে চাঞ্চল্যের অপরূপ লীলা। এক একটা উচ্ছৃঙ্খল ঢেউ জাহাজের চাকা উল্লঙ্ঘন ক'রে তারও উপর পর্যন্ত ঠেলে উঠতে লাগলো, তার স্ফুরজ্জ্যোতির আলোতে কাপ্তেনের সাদা পোষাক আর হাত-দুখানা হঠাৎ এক একবার উজ্জ্বল হ'য়ে উঠতে লাগলো।...

সেই রাত্রেই প্রথম কাপ্তেন তার নিজের শোবার ঘরে চ্যাংকে শুতে নিয়ে গেল। প্রকাণ্ড কেবিন, তার মধ্যে জ্বলছে স্নিগ্ধ লাল আলো। বাতিটা লাল সিল্কের কাপড় দিয়ে মোড়া। বিছানার একপাশে টেবিলটা দেয়ালের গায়ে ঠেসানো, সেখানে

স্তিমিত আলোতে দেখা যাচ্ছে সুদৃশ্য ফ্রেমে বাঁধা দুখানা ফোটোগ্রাফ; একখানাতে একটি ফুটফুটে ছোট মেয়ে এক মাথা কোঁকড়া চুল নিয়ে এক মস্ত আরাম-কেদারায় কৃত্রিম ভঙ্গীতে বসে আছে; আর একখানাতে এক তরুণী—দীর্ঘদেহা, সুন্দরী, যেন রানীর মতো পোষাক পরা, গলায় সাদা লেস, মস্ত এক টুপিতে মুখের অনেকখানি ঢাকা। কাপ্তেন সেই ঘরে নিজের পোষাক ছাড়তে ছাড়তে চ্যাংএর সঙ্গে কথা বলতে লাগলো—

"ঐ যে স্ত্রীলোকটিকে দেখছো চ্যাং, ও কিন্তু তোমাকে পছন্দ করবে না, আমাকে তো নয়ই। একজাতীয় স্ত্রীলোক আছে যারা আজীবন কেবল পরের কাছ থেকে ভালবাসা একতরফাই পেতে চায়, জীবনে কাউকে তারা কখনো আপন ভালবাসা দিতে পারে না। এই সব মেয়েরা হয় হৃদয়হীন, এরা প্রায়ই মিথ্যা কথা কয়, আজগুবি কথা ভাবে, কখনো বা থিয়েটারে গিয়ে অভিনয় করার স্বপ্ন দেখে, কখনো চায় নতুন মোটর-গাড়ী কিনতে, কখনো চলে যায় অচেনা লোকের সঙ্গে পিক্‌নিক করতে,—আর যে-কেউ নতুন স্পোর্টস্‌ম্যান গোছের যুবক পমেটম্ লাগানো পাটকরা চুলে চেরা সিথি কেটে অনাহূত এসে উপস্থিত হয়, তার উপরই এদের যত অহেতুক মোহ লেগে যায়। কিন্তু কে এদের প্রকৃতির বিচার করবে? কে জানে এদের আসল মনের কথা? সকলেই আপন চোখ দিয়ে আপনার জগৎকে

দেখে, নিজের মতলবে যা ভাল বোঝে তাই সবাই করে। কে জানে ওরা তাও-দেবতার কোন গোপন অভিসন্ধি পূরণ করতে এখানে এসে জুটেছে ?—এই গভীর কালো জলরাশির মধ্যে যে সামান্য সমুদ্রচর প্রাণীটা আপন মনে যথেচ্ছা বিচরণ করছে, সেই যে কি অভিসন্ধি পূরণ করছে তাই কি কেউ বলতে পারে ?"

"উঃ—ঃ!" চেয়ারে বসে সাদা জুতোর ফিতে খুলতে খুলতে কাপ্তেন বলতে লাগলো—"উঃ, কি যন্ত্রণাই সেদিন পেয়েছিলাম চ্যাং,—যেদিন প্রথম জানতে পারলাম যে ঐ স্ত্রীলোকটি একান্ত আমারই নয়! সেদিন একলা সে গিয়েছিল একটা বল্‌নাচের উৎসবে, ফিরে এলো একেবারে শেষ রাত্রে যেন ঝরা গোলাপের মতো, ক্লান্তিতে চেহারা ফ্যাকাশে হ'য়ে গেছে তবু উত্তেজনার নেশা তখনো ঘোচে নি, কালো চোখ দুটো বিস্ফারিত, যেন আমার কাছ থেকে কত দূরে সরে গেছে! তুমি যদি তখন একবার দেখতে কেমন চালাকি ক'রে সে আমাকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা করলে, কি যে তার অননুকরণীয় ছলাকলার ভঙ্গী, আমাকে দেখেই কেমন নিতান্ত ভালমানুষের মতো একেবারে অবাক হ'য়ে বললে,—'এ কি, এখনো যে তুমি ঘুমোও নি ?' আমি কোনো কথাই উচ্চারণ করতে পারলাম না। কিন্তু সে তৎক্ষণাৎ আমায় বুঝে নিলে, সঙ্গে সঙ্গে একেবারে চুপ ক'রে গেল; একবার আমার দিকে আড়চোখে চেয়েই মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কাপড় ছাড়তে লাগলো। আমার ইচ্ছে হচ্ছিল তাকে খুন ক'রে

ফেলি, কিন্তু সে যেন অত্যন্ত সহজ সুরে আমায় ডেকে বললে,—'জামার পিছনের বোতামগুলো খুলে দাও তো'। বিনাবাক্যে আমি কাছে এগিয়ে গেলাম, কম্পিত হাতে তার জামার বোতাম আর হুকগুলো খুলে দিলাম,—তারপর যেমনি জামার অন্তরাল থেকে তার অঙ্গের নগ্নতা দেখতে পাওয়া গেল, দুটো কাঁধের মাঝে তার পিঠের চামড়া অনাবৃত হ'য়ে বেরিয়ে পড়লো, তার সেমিজটা কাঁধ থেকে খসে কোমরের কাছে ঝুলে পড়লো,—যেমনি তার মাথার চুলের সেই গন্ধ পেলাম, উজ্জ্বল আলোতে বড় আয়নাটার মধ্যে দেখতে পেলাম কাঁচুলির পাশ থেকে তার সেই উন্নত বক্ষের আভাস—"

এই পর্যন্ত বলে কাপ্তেন আর কথাটা সমাপ্ত করলে না, শুধু হতাশভাবে হাতের একটা অদ্ভুত ভঙ্গী ক'রে থেমে গেল।

কাপড় ছেড়ে কেবিনের আলো নিবিয়ে কাপ্তেন বিছানায় শুয়ে পড়লো, আর চ্যাং টেবিলের পাশে মরক্কো চেয়ারের উপর উঠে বসে দেখতে লাগলো,—সমুদ্রের সেই মসীলিপ্ত বিশাল জলরাশিকে অলঙ্কৃত ক'রে সারি সারি কত আলোকজ্যোতি জ্বলছে আর নিভছে; মধ্যে মধ্যে এক একটা আলেয়ার আলো হঠাৎ সেই সীমাহীন কালো পটভূমির উপর উল্কার মতো জ্বলে উঠছে; এক একটা উত্তাল ঢেউ যেন জীবন্ত হ'য়ে সগর্জনে ছুটে আসছে, জাহাজের সমান উঁচু হ'য়ে কেবিনের মধ্যে উঁকি মারছে,—যেন রূপকথার অজগর সাপের মতো উদ্ধত তার

ফণা, অসংখ্য চোখ তার সারা অঙ্গে জ্বলছে, মণি-মুক্তা হীরা-জহরতের দ্যুতি তার সকল দেহে। ঢেউগুলোকে মথিত ক'রে জাহাজ আপন পথে অগ্রসর হ'য়ে ভেসে চলেছে সেই দোলায়মান বিপুল জলরাশির মধ্যে,—সৃষ্টির প্রাক্কালে যে জল ছিল সর্বত্রই একাকার, এখন আমরা যাকে মাটি থেকে স্বতন্ত্র ক'রে নাম দিয়েছি সমুদ্র···

রাত্রে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কাপ্তেন হঠাৎ একবার চেঁচিয়ে উঠলো; নিজের এই বীভৎস চীৎকার শব্দে তার ঘুম ভেঙে গেল। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে শুয়ে থেকে সে বিদ্রূপের সুরে নিজের মনেই বলিলে—

"হাঁ হাঁ, খাঁটি কথাই হচ্ছে এই। গোখরো সাপের মাথায় যেমন মণি থাকে, রমণীর সৌন্দর্যও তাই। মহাপুরুষ সলোমন, তুমি বলেছিলে এই কথা, তোমার এ মহাবাক্য একেবারে তিনগুণ খাঁটি।"

অন্ধকারে হাতড়ে সিগারেট-কেস্‌টা খুঁজে নিয়ে সে একটা সিগারেট ধরালে, কিন্তু দুটান দিতে-না-দিতেই তার হাতখানা প্রায় অবশ হ'য়ে ঝুলে পড়লো, এই ভাবেই সে আবার ঘুমিয়ে পড়লো, জ্বলন্ত সিগারেটটা হাতে রয়ে গেল। আবার চারিদিক নিস্তব্ধ, কেবল ঢেউগুলো জ্বলতে লাগলো, দুলতে লাগলো, আর সশব্দে জাহাজের গায়ে ধাক্কা মারতে লাগলো।···

অকস্মাৎ একটা বজ্রপাতের মতো ভীষণ শব্দ, চ্যাংএর কানে

যেন তালা লেগে গেল। ভয়ে সে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো। ব্যাপার কি? সেই তিন বছর আগে কাপ্তেন মাতাল হ'য়ে যেমন একবার জাহাজখানাকে ধাক্কা লাগিয়ে দিয়েছিল চোরা পাহাড়ের সঙ্গে, আবার তাই হোলো নাকি? না কাপ্তেন আবার সেই সেদিনের মতো তার সুন্দরী স্ত্রীকে লক্ষ্য ক'রে গুলি ছুড়লে? না না, এতো রাত্রিকাল নয়। এটা সমুদ্রও নয়, কিংবা সেই এলিসাবেথিন্স্কায়া ষ্ট্রীটের বাড়িতে শীতের দিনও নয়,—এটা হচ্ছে এখানকার এই আলোকোজ্জ্বল রেস্তোরাঁ, চারিদিকে কেবল হট্টগোল আর ধোঁয়া। কাপ্তেন মাতাল অবস্থায় বকতে বকতে টেবিলের ওপর সশব্দে ঘুষি মেরেছে, এটা তারই শব্দ। সেই আর্টিষ্ট বন্ধুকে চীৎকার ক'রে সে তখন বোঝাচ্ছে—"ফাঁকি, ফাঁকি! সাপের মাথায় যেমন মণি, তোমার ঐ নারী জাতিটাও ঠিক তাই।—'বিছানার ওপর কেমন চাদর বিছিয়ে রেখেছি, কারুকার্য করা কেমন ঝালর লাগিয়েছি, মিসর দেশের বহুমূল্য আসবাব এনে বিছানা কেমন সাজিয়েছি, ...এস এস একটু প্রণয় উপভোগ করি...স্বামীটি তো এখন বাড়ী নেই'—এই হচ্ছে নারী। মৃত্যুর পাশে থেকেই ওরা খেলা করে, ধ্বংসের পথেই ওরা পা দিয়ে দিয়ে চলে। যাক্ যাক্, যথেষ্ট হয়েছে। চল বন্ধু, এখন যাবার সময় হোলো, এবার ওরা দোকান-পাট বন্ধ করবে, এবার ওঠা যাক।"

এক মিনিট পরেই কাপ্তেন চ্যাং আর সেই আর্টিষ্ট তিনজনে

রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ালো। তখন রীতিমত ঝড় হচ্ছে, বরফ পড়ছে, রাস্তার বাতিগুলো বাতাসে কাঁপছে। কাপ্তেন আর্টিষ্টকে আলিঙ্গন ক'রে বিদায় দিলে, তারপর ওরা দুজনে বিপরীত দিকে চলল। অর্ধঘুমন্ত অবস্থায় কাপ্তেনের পাশে পাশে চ্যাং চলেছে ফুটপাথের উপর দিয়ে ; কাপ্তেন চলেছে টল্‌তে টল্‌তে। আরো একটা দিন কেটে গেল,—এবার এটা স্বপ্ন না সত্য ?—বিশ্বময় আবার কেবল অন্ধকার, কেবল শীত আর ক্লান্তি। নাঃ, কাপ্তেনের কথাই ঠিক, একেবারে খাঁটি সত্য কথা। এ জীবনটা শুধুই নেশা করবার বিষাক্ত দুর্গন্ধ সুরা দিয়ে ভরা, তা ছাড়া আর কিছুই নয়।—

একঘেয়ে দিন আর রাত্রিগুলো চ্যাংএর এমনি ভাবেই কাটতে থাকে। কিন্তু হঠাৎ একদিন সকালে অন্যরকম ব্যাপার ঘটলো। দুনিয়াটা যেন একটা জাহাজের মতো পূরোদমে ছুটে আসতে আসতে কোন জলতলস্থ অদৃশ্য পাহাড়ের গায়ে লেগে খেলে এক প্রবল ধাকা। সেদিন ঘুম থেকে উঠে চ্যাং আশ্চর্য হ'য়ে দেখলে,—ঘর একেবারে নিস্তব্ধ। তাড়াতাড়ি উঠে কাপ্তেনের খাটের কাছে গেল,—দেখলে সে নিশ্চল হ'য়ে পড়ে আছে, ঘাড় বেঁকে গিয়ে মাথাটা খাট থেকে ঝুলছে, মুখখানা একেবারে নীলবর্ণ হ'য়ে গেছে, চোখ দুটি বোজানো, চোখের পলক একটুও নড়ছে না। সেই চোখের পাতা লক্ষ্য ক'রে চ্যাং মরিয়া হ'য়ে এমন তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠলো যেন সে দ্রুতগামী

মোটরের তলায় হঠাৎ চাপা প'ড়ে গেছে।···তারপর সেই ঘরের দোর ভেঙে বিস্তর বাইরের লোক এসে ভিতরে ঢুকলো, আবার বেরিয়ে গেল, আবার এসে ঢুকলো, কত রকম কলরব করতে লাগলো ; হরেক রকমের সব লোক,—দরোয়ান, পুলিশ, লম্বা হ্যাট্ মাথায় সেই আর্টিস্ট, আরো কত মানুষ যারা রেস্তোরাঁয় রোজ কাপ্তেনের সঙ্গে বসে খেতো,—ব্যাপার দেখে-শুনে চ্যাং একেবারে ভারী পাথর হ'য়ে গেল। আহা, কাপ্তেন কত ভয়ে ভয়েই তখন বলতো,—"একদিন বাড়ীর লোকেরা সবাই ভয়ে কাঁপবে···যারা জানলা দিয়ে চেয়ে দেখবে তাদের মুখ অন্ধকার হ'য়ে যাবে···যে ঘটনা সব চেয়ে সত্য তাই যখন ঘটবে তখন সকলেই ভয় পাবে···মানুষ চলে যাবে তার চির-কালের ঘরে, আর শোক-প্রকাশকেরা পথে বেরুবে সারে সারে ···যেমন ঝরণার কাছে গেলে কলসী যায় ফেঁসে, আর কূয়ার কাছে পৌঁছলেই গাড়ীর চাকা পড়ে খসে···" এমনি কত রকমের কথা। কিন্তু চ্যাং সেই সব দৃশ্য দেখেও এখন আর কোনো ভয় অনুভব করতে পারলে না। সে মেঝের ওপর প'ড়ে রইল কোণের দিকে মুখ দিয়ে ; চোখ দুটো চেপে বন্ধ ক'রে রইল যাতে কিছুই আর না দেখতে হয়, যাতে সব ভুলে থাকতে পারে। জলে ডুবে যেতে যেতে যেমন সমুদ্রগর্জন কানে ক্ষীণতর শোনায়, তেমনি পৃথিবীর কোলাহল অতি কাছের থেকেও দূরশ্রুত শব্দের মতো সে শুনতে লাগলো অতি ক্ষীণভাবে।

যখন তার চৈতন্য ফিরে এলো তখন দেখলে সে এক গির্জার দরজার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ভিতরে অনেক লোকের ভিড়, সেই ভিড়ের একপাশে মাথা গুঁজে সে বসলো; উদ্‌ভ্রান্তের মতো, অর্ধমৃতের মতো,—তার সর্বাঙ্গ তখন থর্ থর্ করে কাঁপতে লাগলো। গির্জার ভিতরে আধা অন্ধকার, সেখানে এক অদ্ভুত দৃশ্য চ্যাং প্রত্যক্ষ করলে। বহুলোক একযোগে গম্ভীর মধুর স্বরে কি যেন গুঞ্জনধ্বনি ক'রে উঠলো। চ্যাংএর চোখের সামনে এক বিরাট মঞ্চ, চারিদিকে প্রজ্বলিত লাল আলো, বহু লতাপাতা দিয়ে ঘেরা কৃষ্ণবর্ণ উঁচু বেদীর উপর রয়েছে ওক্-কাঠের এক শবাধার। সকলেরই কালো পোষাক; তার মধ্যে দুই ভিন্ন বয়সের দুটি অপরূপ সুন্দরী, কালো পোষাকে যেন মার্বেল পাথরের দুটি প্রতিমার মতো, দেখে মনে হয় যেন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে ছোট বড় দুই বোন। বহু বাদ্যযন্ত্র একসঙ্গে বেজে উঠলো, সকলে উচ্চতানে তার সঙ্গে সুর মিলিয়ে গেয়ে উঠলো কোন স্বর্গলোকের শান্তিপূর্ণ স্তবগাথা,—গুরু-গম্ভীর বজ্রনির্ঘোষের মতো চারিদিক থেকে তার প্রতিধ্বনি উঠলো। উদাত্ত, প্রশান্ত, দূরপ্রসারী,—সে সম্মিলিত ধ্বনি যেন এ-জগতের নয়, সমস্ত তুচ্ছ পার্থিব শব্দ তাতে নিমগ্ন হ'য়ে যায়। এই সমবেত সঙ্গীতে বিহ্বল চ্যাংএর প্রত্যেক লোমটি খাড়া হ'য়ে উঠলো, কি এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় তার সমস্ত প্রাণ আকুলিবিকুলি ক'রে উঠলো। সেই আর্টিষ্ট বন্ধু চোখ দুটি

লাল ক'রে এই সময় গির্জা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, চ্যাংকে দেখে আশ্চর্য হ'য়ে থমকে দাঁড়ালো। চ্যাংএর কাছে মুখ নামিয়ে ব্যগ্র ভাবে বললে—

"চ্যাং! কেন রে চ্যাং, তোর কি হয়েছে রে?"

কম্পিত হাতখানি সে চ্যাংএর মাথার উপর রাখলে,—হেঁট হ'য়ে সে মুখটা আরো নীচু করলে, দুজনের জলভরা চোখ পরস্পর মিলিত হোলো। সে দৃষ্টিতে পরস্পরের মধ্যে কি প্রেম, কি সহানুভূতি! চ্যাংএর সমস্ত অন্তরাত্মা যেন চীৎকার ক'রে বলে উঠলো—"না, না, না,—পৃথিবীতে আরো কিছু তৃতীয় সত্য আছে, এটা আমি আগে কখনো জানতাম না।"

সেইদিন কবর থেকে ফিরে চ্যাং গেল তার তৃতীয় প্রভুর ঘরে। এখানেও সিঁড়ি দিয়ে উঠে একটা কুঠুরি। কিন্তু ঘরটা বেশ গরম, সর্বদা সেখানে চুরুটের গন্ধ, মেঝেতে কার্পেট বিছানো, চারিদিকে নানারকম প্রাচীন যুগের আসবাব, দরজায় নানারকমের পর্দা ঝুলছে।...

সন্ধ্যা হ'য়ে এলো। উনানের ভিতর গন্‌গনে আগুন জ্বলছে; চ্যাংএর নতুন মনিব একটা চেয়ারে বসে আছে। বাড়ী এসে পর্যন্ত সে মাথার টুপিটাও খোলেনি, গায়ের ওভার-কোটটাও ছাড়েনি। চুরুট ধরিয়ে নিয়ে একটা মস্ত চেয়ারে সে বসে আছে, কেবল ধোঁয়া ছাড়ছে আর সেই চিত্রগৃহের

ঘনায়মান অন্ধকারের দিকে চেয়ে আছে। ক্লান্ত জর্জ্জরিত চ্যাং বেচারী ম্রিয়মান হ'য়ে আগুনের পাশে কার্পেটের ওপর পড়ে আছে, চোখ দুটি মুদ্রিত, সামনের পায়ের ওপর মুখটা গুঁজে রেখেছে। সে স্বপ্নের ঘোরে যেন দেখছে—

এই অন্ধকার শহর অতিক্রম ক'রে বহুদূরে সেই গোর-স্থানের পাঁচিলের গায়ে কবরের মধ্যে কে একজন শুয়ে আছে। কিন্তু এ সেই কাপ্তেন নয়—না, এ আর সে মানুষটি নয়। চ্যাং যদি এখনও কাপ্তেনকে ভালবাসে আর এখনও তার সান্নিধ্য অন্তরে অন্তরে অনুভব করে, যদি সে তাতে স্বর্গীয় কিছুর আভাস পায় যা সে নিজেই বুঝতে পারে না,—তা হ'লে এই কথাই মেনে নিতে হবে যে কাপ্তেন এখনও তার কাছে জীবন্তই রয়েছে। সে রয়েছে এখন সেই জগতে যার আদি নেই, অন্ত নেই, মৃত্যু যেখানে প্রবেশ করতে পারে না। সেই জগতে আছে কেবল একটি মাত্র সত্য,—সে বুঝি তৃতীয় সত্যটা; কিন্তু সে সত্য যে কি তা জানে মাত্র আর একজন প্রভু, যার কাছে চ্যাং একদিন শীঘ্রই গিয়ে উপস্থিত হবে।

সর্দিগরমি

সান্ধ্যভোজন সেরে ওরা দুজনে বাইরে বেরিয়ে এলো, জাহাজের খাবার ঘরের তীব্র আলো আর বন্ধ বাতাস থেকে পালিয়ে এসে ওরা খোলা ডেকের উন্মুক্ত হাওয়াতে রেলিংএর ধারে পাশাপাশি দাঁড়ালো। মেয়েটি সেই রেলিংএর উপর কনুই রেখে গালে হাত দিয়ে কিছুক্ষণ চোখ বুজিয়ে রইল, তারপর আপন মনে খিল্‌খিল্‌ করে হেসে উঠলো। প্রাণখোলা স্বচ্ছ সেই হাসিটি বড় মধুর,—এ মেয়েটির সকল কিছুই এমনি মধুর।

অনর্গল হাসতে হাসতে যুবকটিকে সে বললে—"দেখ, সত্যি বলছি, নিশ্চয় আমি মাতাল হয়েছি কিংবা ক্ষেপে গেছি। নইলে কোথাও কিছু নেই, কেমন ক'রেই বা এতটা হোলো,— আর কোথা থেকেই বা তুমি হঠাৎ আমারই সামনে এসে উদয় হ'লে? মাত্র তিন ঘণ্টা আগেও আমি তোমাকে মোটে চিনতুম না, স্বপ্নেও জানতুম না যে তোমার মতো একটা মানুষ

পৃথিবীতে থাকতে পারে। কোথায় কোন ঘাটে যে তুমি জাহাজে এসে উঠলে তাও আমি তখন দেখিনি। হয়তো সামারা থেকে উঠেছ, নয় কি ? সে যাই হোক, তুমি কিন্তু বড় সুন্দর, বড় ভালো। দেখ, মাথাটা আমার কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে, —জাহাজটা বুঝি খুব দুলছে ?”

যেখানে ওরা দাঁড়িয়ে আছে তার সুমুখে নদীবক্ষে গভীর অন্ধকার, কেবল দূরে দেখা যাচ্ছে তীরের উপর কতকগুলো বাতির আলো। ভল্‌গা নদীর প্রখর বাতাস জাহাজের গা বেয়ে ঝড়ের মতো এসে ওদের মুখে আঘাত করতে লাগলো, ক্রমশ আলোগুলো ওদের নিকটবর্তী হ'তে লাগলো। জাহাজ-খানা একচক্র ঘুরপাক খেয়ে উল্টাদিকে মুখ ক'রে একটি ছোট জেটির গায়ে ভিড়তে শুরু করলে।

যুবকটি কোনো সৈন্যদলের লেফ্‌টেনান্ট। মেয়েটির হাতখানি একবার নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে অতি মৃদুভাবে সে একটি চুম্বন করলে। নিটোল সেই ক্ষুদ্র হাতখানি, অবর্ণনীয় তার একপ্রকার সুরভি, রোদে ঝল্‌সানো তার অপূর্ব রং। মেয়েটি নাকি বলেছে, ইটালির দক্ষিণ সমুদ্রতীরবর্তী স্বাস্থ্যকর আনাপিতে সে গিয়েছিল সমুদ্রসৈকতে রৌদ্রস্নান ক'রে স্বাস্থ্য ভালো করতে, একমাস পরে সম্প্রতি সেখান থেকে ফিরছে। ঐ যে তার হাল্কা রংএর সূক্ষ্ম গাত্রবস্ত্রের অন্তরালে অদৃশ্য হ'য়ে রয়েছে তার লব্ধস্বাস্থ্য সুপুষ্ট দেহখানি, না-জানি কেমন অপরূপ

হবে তার গঠন-রহস্য, ভাবতেই ওর বুকের ভিতরটা আবেগে ও উৎকণ্ঠায় দুর্ দুর্ করতে লাগলো।

হঠাৎ ও বলে উঠলো—"চলো আমরা এখানেই নামি।"

মেয়েটি আশ্চর্য হ'য়ে বললে—"সে কি, কোথায় নামবো ?"

"এইখানে, এই জেটিতে।"

"কেন, এখানে কেন নামবো ?"

ও চুপ ক'রে রইল। মেয়েটি আবার তেমনি গালে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে বললে—"তুমি বদ্ধ-পাগল।"

ও তখন জিদ্ ক'রে বলতে লাগলো—"হাঁ তাই, কিন্তু তুমি চলো, যেতেই হবে তোমাকে। শুনবে না আমার কথা? শোনো আমি বলছি, এখানেই তোমাকে নামতে হবে—"

মুখ ফিরিয়ে মেয়েটি বললে—"বেশ, তাই চলো, তোমার যেমন খুশি তেমনি করো।"

জাহাজখানা কাঁপতে কাঁপতে গিয়ে জেটির গায়ে ধাক্কা খেয়ে থামলো, টাল সামলাতে না পেরে ওরা দুজনে পরস্পরের গায়ের উপর পড়লো। জাহাজ থেকে তখন দড়ি ফেলা হোলো, ধাক্কা খেয়ে জাহাজখানা একটু সরে গেল, প্রচণ্ড আলোড়নে নদীর জলে ফেনা উঠতে লাগলো, ঝন্ঝন্ শব্দে যাত্রী নামাবার সিঁড়ি পেতে দেওয়া হোলো। লেফ্‌টেনাণ্ট তখন ছুটলো নিজেদের মালপত্র নামাতে।

অল্পক্ষণ পরেই ওরা জেটি পার হ'য়ে টিকিটঘর পার হ'য়ে

উঠলো, গিয়ে একটা নির্জন বালির রাস্তায়, সেখানে একটা লক্কড় গোছের ভাড়া-গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে দেখে দুজনে তারই উপর চেপে বসলো। নদীর ধার থেকে সেই ঢালু রাস্তাটা এঁকে বেঁকে চলেছে, পথের ধারে মাঝে মাঝে এক একটা ল্যাম্প-পোষ্ট থেকে মিট্‌মিট্‌ ক'রে আলো জ্বলছে। পথটা যেন আর ফুরোতে চায় না। ঢালু রাস্তার পর এলো সমান রাস্তা, তারপরে খানিকটা চৌমাথার মতো জায়গা, কতকগুলো সরকারি বাড়ি, একটা গির্জা, একটা প্রকাণ্ড ঘটিকাস্তম্ভ। গুমোট গরম অন্ধকার রাত্রি, চারিদিকে গ্রাম্য আবহাওয়ার বিচিত্র গন্ধ। যে হোটেলের গাড়িবারান্দায় গিয়ে ওদের গাড়িটা থামলো, সেখানে আলো জ্বলছে। পায়ের চটিজোড়া ঘষ্‌তে ঘষ্‌তে দেখা দিল হোটেলের চাকর, গায়ে লাল কামিজ আর কালো কোর্তা, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। যেন অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে সে ওদের মালপত্রগুলো নামিয়ে নিলে, পথ দেখিয়ে ওদের নিয়ে চলল অতি প্রাচীন এক কাঠের সিঁড়ির উপর দিয়ে। মস্ত একটা ঘরের মধ্যে গিয়ে ওরা ঢুকলো। তার ভিতরকার বদ্ধ হাওয়াটা তখনো বেশ গরম। সারাদিন পর্দা খোলা ছিল, ঘরটা সারাদিন রোদ খেয়েছে, তখনো ভিতরটা ঠাণ্ডা হয়নি। ঘরের মধ্যে একটা টেবিল, তার উপরে রাখা আছে দুটো নতুন বাতি।

চাকরটা যেমনি দরজা ভেজিয়ে দিয়ে চলে গেল, লেফ্‌টেনাণ্ট তৎক্ষণাৎ উন্মত্তের মতো ঝাঁপিয়ে গিয়ে মেয়েটিকে যেন একেবারে

গ্রাস করে নিল রুদ্ধনিঃশ্বাসে চুম্বনের পর চুম্বন করতে, করতে কামনার অপূর্ব উন্মাদনায় ওরা দুজনে তখনই কোন অতলস্পর্শে তলিয়ে গেল। বহুকাল পরেও বহু যুগ পর্যন্ত এর স্মৃতি ওরা ভুলতে পারেনি। এমন ধরণের আশ্চর্য অনুভূতি ওরা জীবনে কখনো আর পায়নি।

তার পরের দিনই সকালে দশটার সময় সেই অপরিচিতা মেয়েটি ওখান থেকে চলে গেল। নিজের নামটি সে কিছুতেই বলেনি। যতবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছে ততবার তামাশা ক'রে শুধু বলেছিল—"আমার নাম বিদেশিনী।"

বেলা হ'য়ে তখন খুব রোদ উঠে গেছে, সেদিনও বেশ গরম। কাছেই কোথায় গির্জার ঘণ্টা বাজছে, হোটেলের সামনে খোলা মাঠের উপর মস্ত হাট বসেছে, সেখানে অনেক ভিড় জমে গেছে। হাটের দিক থেকে বিচালির গন্ধ, আলকাৎরার গন্ধ, আর তার সঙ্গে বিচিত্র একরকম সোঁদা মেঠো গন্ধ বাতাসে ভেসে আসছে।

সারা রাত্রিটাই ওরা প্রায় জেগে কাটিয়েছে। কিন্তু সকালে যখন মেয়েটি মুখহাত ধোয়া পাঁচমিনিটেই সেরে নিয়ে বাথরুমের পর্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো, তখন তাকে দেখে মনে হোলো যেন সতেরো বছরের এক আনকোরা তন্বী কিশোরী। মনে মনে তখন কিঞ্চিত অপ্রতিভ হ'য়ে থাকবে কি? যদিও হ'য়ে থাকে, সে খুবই সামান্য। আগের দিনের মতো আবার

তেমনি হাসিখুশি, তেমনি সহজ, ইতিমধ্যেই কাণ্ডজ্ঞান ফিরে এসেছে। লেফ্‌টেনান্ট যখন অনুরোধ করলে যে আরো কিছুক্ষণ থাকো, দুজনে একসঙ্গেই একই জাহাজে ওঠা যাবে, তখন সে বললে—"না না তা হয় না, তুমি বরং এখন থাকো, পরের জাহাজে যাবে। একসঙ্গে গেলেই সব মাটি হ'য়ে যাবে, সে আমার ভারী বিশ্রী লাগবে। তুমি হয়তো আমার সম্বন্ধে মনে মনে কত কী খারাপ ধারণা ক'রেছো, কিন্তু তুমি বিশ্বাস করো আমি সত্যি বলছি, যা ভেবেছো আমি মোটেই সেরকম ধরণের নয়। এমনতরো অদ্ভুত কাণ্ড আমার জীবনে আর কখনো ঘটেনি এবং আর কখনো ঘটবেও না। আমার চোখে বোধ হয় হঠাৎ কোনো কুহক লেগেছিল। শুধু আমার একার নয়, বোধ হয় দুজনেরই ঠিক একই ব্যাপার। যেমন হঠাৎ সর্দিগরমি লেগে যায় না, আমাদের দুজনেরই বোধ হয় সেই রকম একটা কিছু হয়েছিল।"

লেফ্‌টেনান্ট তখন তার এক কথাতেই পৃথকভাবে থেকে যেতে রাজি হ'য়ে গেল। নিশ্চিন্তচিত্তে দিব্য হাসতে হাসতে গাড়িতে উঠিয়ে তাকে জেটি পর্যন্ত নিয়ে গেল, নিজে সঙ্গে থেকে জাহাজে উঠিয়ে তাকে বিদায় দিলে। ডেকের উপর দাঁড়িয়ে ও সহজভাবেই তাকে শেষ চুম্বন করলে, তারপর সিঁড়ি উঠিয়ে নেবার সময় হয়েছে দেখে তাড়াতাড়ি জাহাজ থেকে নেমে পড়লো। যেন কিছুই হয়নি এমনি আনমনা ভাবেই ও

একা হোটেলে ফিরে গেল। তখন প্রথম সে টের পেলে যে কোথাও কিছু যেন বিগ্‌ড়ে গেছে।

সেই শূন্য ঘর—যে ঘরে কিছুক্ষণ আগেই ওরা ছিল, এ যেন সে ঘরের মতোই দেখাচ্ছে না, সম্পূর্ণ আলাদা রকমের লাগছে। এখানে এখন আর সেই মেয়েটি নেই, কিন্তু মনের ভিতরটা তার স্মৃতিতেই সর্বক্ষণ ভরপুর। যদিও তাতে কিছু যায় আসে না, কিন্তু ব্যাপারটা বড় অদ্ভুত দাঁড়াচ্ছে, এমনটা ও কল্পনাও করেনি। এখনো ঘরময় পাওয়া যাচ্ছে তার গায়ের সেই বিলাতী ল্যাভেণ্ডারের গন্ধ, চা-দানির উপর এখনো পড়ে রয়েছে তার অর্ধভুক্ত চাএর পেয়ালা, অথচ সেই মানুষটিকে আর দেখা যাচ্ছে না কোথাও, সে চলে গেছে।···ওর বুকের মধ্যে হঠাৎ অভূতপূর্ব একটা বেদনা. এমন জোরে মোচড় দিয়ে উঠলো যে ও আর স্থির থাকতে পারলে না, তাড়াতাড়ি সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে ও ঘরময় পায়চারি ক'রে বেড়াতে লাগলো, অস্থির হ'য়ে হাতের বেতগাছটা দিয়ে পায়ের বুটের ওপর বারবার আঘাত করতে লাগলো।

চোখ দুটি তখন দেখতে দেখতে জলে ভরে উঠেছে। ছলছল চোখে হাসতে হাসতে ও আপনার মনেই বলে উঠলো—"আশ্চর্য রকমের একটা অ্যাডভেঞ্চার'হোলো বটে।···কি যেন তখন বলে গেল,—'তুমি বিশ্বাস করো আমি সত্যি বলছি, তুমি

যেমন ভেবেছো আমি মোটেই সে ধরণের নয়,'—বললে, আর তারপরেই বেশ স্বচ্ছন্দে চলে গেল। আশ্চর্য মেয়ে!"

শয্যাপার্শ্বের পর্দাটা রয়েছে সরানো,—বিছানাটা আর ঝেড়ে পাতা হয়নি, তেমনি এলোমেলো হ'য়ে আছে। সেই বিছানার দিকে একবার ভাল ক'রে চাইতে পর্যন্ত ওর সাহস হোলো না, তাড়াতাড়ি পর্দাটা টেনে এনে তার সামনে আড়াল করে ঢাকা দিয়ে দিলে। হাটের লোকদের হট্টগোল আর রাস্তার গাড়ি-গুলোর ঘড়ঘড়ানির শব্দ কানে সহ্য করা যায় না, বাইরের জানলাগুলো চেপে বন্ধ ক'রে সেখানেও পর্দা টেনে দিয়ে ও সোফার উপর বসে পড়লো। হাঁ, সেও চলে গেছে, পথযাত্রার এই অদ্ভুত অ্যাডভেঞ্চারও এবার ফুরিয়ে গেছে। এতক্ষণে কতদূরে সে চলে গেল, এখন হয়তো একটা কেবিনের জানলার ধারে নয়তো ডেকের উপর বসে চেয়ে চেয়ে দেখছে বিস্তীর্ণ জলের উপর রোদের ঝিকিমিকি খেলা, পালতোলা কত নৌকা ভেসে যাচ্ছে উজান বেয়ে, দৃষ্টিসীমা পার হ'য়ে বিশাল ভল্‌গা নদীর জলের সঙ্গে মিশে গেছে আকাশের দিগন্তরেখা। সে বিদায় নিয়ে চলে গেল চিরদিনের মতো, চিরকালের মতো। আর কোথাও কখনো কি তার সঙ্গে আবার দেখা হওয়া সম্ভব? এ প্রশ্ন উঠতেই ও নিজের মনে বললে—"যে শহরে সে তার স্বামীর সঙ্গে সাজানো সংসার পেতে সুখের মধ্যে বাস করছে, সেই সংসারে রয়েছে তার অনেক আত্মীয়স্বজন, একটি তিন বছরের

ছোট মেয়ে আছে তাও শুনেছি, তার মাঝখানে আমি কোন আক্কেলে কেমন ক'রে গিয়ে উপস্থিত হ'তে পারি? না, তা হয় না। সে শহরের ত্রিসীমানায় যাওয়াই আমার পক্ষে এখন নিষিদ্ধ।"

ভাবতে ভাবতে আবার একটা নতুন চিন্তা এসে জুটলো, তাতেও আরো বিচলিত হ'য়ে উঠলো। মেয়েটিও হয়তো এর পর সেখানে গিয়ে এমনি নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতে করতে মনে মনে এমনি ওর কথাই ভাবতে থাকবে, থেকে থেকে বার বার মনে পড়বে এই সংক্ষিপ্ত মিলনের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি কথা, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও মনে হবে যে ওদের পরস্পরের সাক্ষাৎ ভবিষ্যতে আর কখনই ঘটবে না। সত্যিই কি ঘটবে না? না, সেটা একেবারে অসম্ভব, যত কষ্টই হোক তবুও তা অসম্ভব। সে রকম আশা করা নিতান্তই পাগলামি, নিতান্তই অসঙ্গত, যাকে বলে আকাশকুসুম। কিন্তু তবু ওর যখন এইটে ধারণা হোলো যে তাকে আর কখনো না দেখতে পেলে ওর সারা-জীবনটা একেবারে ব্যর্থ হ'য়ে যাবে, তখন ভয়ে এবং নিরাশায় ও নিতান্ত ব্যাকুল হ'য়ে উঠলো, অব্যক্ত এক রকম ব্যথায় মনের ভিতরটা বেজায় টন্‌টন্ ক'রে উঠলো। "দূর হোক্‌গে ছাই"—বলতে বলতে সোফা থেকে লাফিয়ে উঠে আবার ও ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলো, কিন্তু পর্দাঘেরা বিছানাটার দিক থেকে বরাবর চোখ ফিরিয়ে রইল, সেদিকে আর মোটে

চাইবে না।—"এ আমার হয়েছে কী? এই যে আমার প্রথম প্রেমের অভিজ্ঞতা তাতো নয়! তবে? মেয়েটির মধ্যেই বিশেষ নতুন রকমের কিছু ছিল, না আমার মধ্যেই অদ্ভুত কিছু ঘটেছে? সে যা বলেছিল তাই সত্যি হোলো দেখছি, হঠাৎ যেন একটা সর্দিগরমির মতো ব্যাপার। কিন্তু এখন কথাটা হচ্ছে এই যে আর তো সে নেই, একা একা এই অন্ধকূপের মধ্যে সারাদিনটা আমি কাটাই কেমন করে?"

মেয়েটির সম্বন্ধে যত কথা, যত খুঁটিনাটি, একসঙ্গে সব তন্নতন্ন ক'রে ওর মনে পড়তে লাগলো। তার সেই রোদে-পোড়া গায়ের রং, পাতলা কাপড়ের সেই জামাটি, দেহের পরিপুষ্ট গড়নটা, উজ্জ্বল হাসিটি, সরল খুশিভরা কণ্ঠস্বরটি,···তার নারাত্বের অপূর্ব স্পর্শে যে অপার্থিব আনন্দের চেতনা জেগে উঠেছিল এখনো তা তেমনি নবীন হ'য়ে রয়েছে। কিন্তু তা ছাড়াও এখন সব চেয়ে বড় হ'য়ে উঠেছে,—অভিজ্ঞতার অতীত এক অদ্ভুত রকমের আকুতি। যতক্ষণ দুজনে একত্রে ছিল ততক্ষণ মোটেই টের পায়নি, গতকাল পর্যন্ত ও জানতো না যে এ ধরণের আকুতি ওর জীবনে কখনো সম্ভব হতে পারে। জাহাজে প্রথম যখন আলাপ জমে উঠলো তখন ভেবেছিল এ একটা ক্ষণিকের পরিচয়, ক্ষণিকের আনন্দ কুড়িয়ে পাওয়া বৈ তো কিছুই নয়। কিন্তু এখন একি হোলো? আনন্দ যতটুকু, স্মৃতিটা তার চেয়ে অনেক বড় হ'য়ে উঠলো। এ সব কথা কাকেই বা ও বলবে? মন খুলে

যাকে সমস্ত কথাটাই একবারও বলা যায় এমন কেউ নেই, একজনও ওর কেউ নেই। ও ভাবলে—"সেই তো হোলো মহা মুশকিল, জীবনে কখনো কারো কাছে আমি একথা বলতেই পারবো না। এই দুর্বহ স্মৃতি নিয়ে, এই নিরুদ্ধ বেদনা নিয়ে একা একা আমি এখন সারাটা অফুরন্ত দিন কাটাই কেমন ক'রে? ঐ ভল্‌গা নদীর স্রোতে ভেসে জাহাজখানা তাকে নিয়ে চলে গেছে দূর থেকে দূরান্তের পানে, আর সেই নদীর তীরে শুধু শুধু এই লক্ষীছাড়া শহরের মধ্যে কেমন ক'রে আমি একা পড়ে থাকবো?"

নিজেকে রক্ষা করতে হ'লে ওর এখনই একটা কিছু করা দরকার, কোথাও বেরিয়ে যাওয়া উচিত, যেখানে খানিকটা অন্যমনস্ক হ'তে পারবে। মনে মনে দৃঢ়সঙ্কল্প করে নিয়ে ও টুপিটা মাথায় দিলে, ছড়িটা হাতে নিলে, তারপর গট্‌গট্‌ ক'রে বারান্দা পার হ'য়ে ত্বরিতগতিতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে একেবারে গাড়ি-বারান্দায় গিয়ে উপস্থিত হোলো। কিন্তু এর পর যাবে কোথায়? হোটেলের সুমুখে একটা ভাড়াটে গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। গাড়ির মাথায় এক ফিট্‌ফাট গাড়োয়ান ছোকরা বসে নিশ্চিন্ত মনে চুরোট টানছে, বোধহয় ভাড়াটের জন্যে অপেক্ষা করছে। লেফ্‌টেনান্ট তাকে দেখে অবাক হ'য়ে চেয়ে রইলো;—কেমন ক'রে মানুষে এমন নির্লিপ্তভাবে বসে বসে এমন নিশ্চিন্ত মনে চুরোট ফুঁকতে পারে?—"বুঝেছি, বোধ হয় এই সারা শহরে

আমার মতো অসুখী, আমার মতো হতভাগা আর কেউ নেই"— এই কথা ভাবতে ভাবতে ও চলে গেল হাটের দিকে।

হাট তখন ভাঙতে শুরু হয়েছে। চলতে চলতে কখন অহেতুক ও সেই হাটের জনতার মধ্যে ঢুকে পড়েছে। হঠাৎ চেয়ে দেখলে গোবর কাদা মাড়িয়ে চলেছে সে গরুর গাড়ির ভিড়ের ভিতর দিয়ে, চারিদিকে রয়েছে স্তূপাকার হাঁড়িকুড়ির দোকান, ঝুড়ি ঝুড়ি শসা বিক্রি হচ্ছে, মেয়ে-ব্যাপারীরা হাতমুখ নেড়ে তারস্বরে চীৎকার করছে ওর মনোযোগ আকর্ষণ করবার জন্যে। কেউ বা ওর মুখের কাছে একটা হাঁড়ি এনে বাজিয়ে বাজিয়ে দেখাচ্ছে জিনিসটা কত মজবুত, কেউবা ওর কানের কাছে মুখ এনে চেঁচিয়ে কানে তালা ধরিয়ে দিয়ে বলছে—"হুজুর একটু চেখে দেখুন, একেবারে ফার্ষ্ট ক্লাস শসা।" মহা বিব্রত হ'য়ে ও মাঠ ছেড়ে পালালো। তাড়াতাড়ি গিয়ে ঢুকলো এক গির্জার মধ্যে। সেখানে বহু কণ্ঠে প্রার্থনাসঙ্গীত উদ্‌গীত হচ্ছে উদাত্ত একটানা সুরে, যেন ঘটা ক'রে একটা কর্তব্য পালন করা চলেছে। আবার বিব্রত হ'য়ে ওখান থেকে বেরিয়ে অনির্দিষ্ট পথে বেড়াতে বেড়াতে ও গিয়ে পড়লো নদীর ধারে একটা বাগানের মতো জায়গায়।

রোদ লেগে ওর কোটের উপরকার পিতলের ব্যাজ আর বোতামগুলো এমন তেতে উঠেছে যে হাত দিলে হাতে ছেঁকা লাগে। মুখের চামড়াটা রোদে ঝলসে যাচ্ছে, টুপির ভিতরটা

ঘামে ভিজে জব্‌জব্‌ করছে। এই অবস্থায় অবশেষে হোটেলে ফিরে গিয়ে ও শূন্য খাবার-ঘরটায় ঢুকে পড়লো, সেখানে টুপিটা খুলে রেখে জানলার ধারে একটা টেবিলের পাশে চেয়ার নিয়ে বসে যেন একটু আরাম বোধ করলে। যদিও খুব গরম তবু এখানটায় কিছু হাওয়া আছে। ও হুকুম ক'রে দিলে বরফ-সরবত আনতে।

এই অজানা শহরটার সব কিছুই ভালো,—ঐ প্রচণ্ড রোদের তাপে, ঐ হাটের ভিতরকার নানারকম মিশ্রিত গন্ধে, সব কিছুতেই লেগে রয়েছে একটা সহজ তৃপ্তির ও আনন্দের আভাস। এমন কি এই যে এঁদোপড়া একটা পুরানো হোটেল, এর মধ্যেও যেন আনন্দের অভাব নেই। তবু এই সমস্তের মাঝখানে বসে ওর বুকের ভিতরটা খামকাই ছিঁড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো হ'য়ে যাচ্ছে। ও উপর্যুপরি কয়েক গ্লাস ভড্‌কা পান ক'রে নিলে, নুন দিয়ে খানিকটা শসা চিবিয়ে খেয়ে ফেললে। আপনার মনে বলতে লাগলো যে কালই যদি ওর মৃত্যু হয় তো হোক, তাতে কিছুমাত্র আপত্তি নেই,—কেবল যদি এই আজকের দিনটা, এই একটিমাত্র দিন কোনো ইন্দ্রজালের জোরে মেয়েটিকে এখানে আবার একবার ফিরিয়ে আনা যায়, যদি শুধু এই দিনটি তার সঙ্গে আবার একত্রে কাটানো যায়; আর কিছুর জন্যে নয়, কেবল, কেবল তাকে ওর নিজের কথা বলবে,—তাকে ভাল ক'রে প্রত্যয় করিয়ে দেবে যে কত গভীর ওর ভালবাসা, কত গভীর তার ব্যথা।—"কিন্তু

এত প্রমাণের কি দরকার ? জানিয়ে দিলেই বা কি ফল হবে ?”
তা সে জানে না, কিন্তু এটা জানানো এখন নিতান্তই দরকার
মনে হচ্ছে, প্রাণ নিয়ে বেঁচে থাকার চেয়েও এরই দরকার এখন
যেন অনেক বেশি।

“আমার ভিতরকার স্নায়ুগুলো নিশ্চয় সব বিগ্‌ড়ে গেছে”—
এই কথা সিদ্ধান্ত ক’রে ও চতুর্থ গ্লাসের পর আবার নতুন ক’রে
গ্লাসের মধ্যে ভড্‌কা ঢেলে নিয়ে এক চুমুকে সবটা শেষ ক’রে
ফেললে। নিজেকে ও এখন অসাড় ক’রে ফেলতে চায়,
চিন্তাশক্তিকে অবশ ক’রে দিতে চায়, যাতে এই যন্ত্রণাদায়ক
অদ্ভুত মনশ্চাঞ্চল্য থেকে উপস্থিত খানিকটা রেহাই পেতে
পারে। কিন্তু তা তো হোলোই না, বরং আরো বেড়ে গেল।
ঠাণ্ডা সরবতের গ্লাসটা ঠেলে ফেলে দিয়ে ও হুকুম করলে গরম
কফি আনতে, তারপর সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে আবার নতুন
ক’রে ভাবতে শুরু করলে। এখন কী করা যায়, কোন উপায়ে
সে এই অপ্রত্যাশিত আকস্মিক অনুরাগের লৌহকবল থেকে
মুক্তি পেতে পারে ? মুক্তির কথা যেমনি মনে হলো, অমনি
সঙ্গে সঙ্গে এটাও স্পষ্ট বুঝে নিলে যে যদিও কথায় বলছে বটে,
কিন্তু কাজে তা ওর পক্ষে একেবারে অসম্ভব। হঠাৎ ধড়মড়
ক’রে ও চেয়ার ছেড়ে উঠে প’ড়লো, টেলিগ্রাফ অফিসের
ঠিকানাটা জেনে নিয়ে টুপি ছড়ি বগলে ক’রে ছুটলো তারই
উদ্দেশে। পথে যেতে যেতেই মনে মনে রচনা ক’রে নিলে,

টেলিগ্রামে শুধু এই কথা লিখবে—"আজ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত চিরদিন আমার জীবন রইল শুধু তোমার প্রত্যাশায়।" মোটা থামওয়ালা পুরানো পোস্ট-অফিসের টেলিগ্রাফ ঘরের কাছে পৌঁছে ও হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে গেল। মেয়েটির শহরের নাম ও জানে, তার স্বামী আছে আর তিন বছরের একটি মেয়ে আছে তাও জানে, কিন্তু আসলে তার নিজের কি যে নাম তাই তো জানে না! মনে আছে রাত্রে হোটেলে বসে খেতে খেতে ও অনেকবার তার নাম জানতে চেয়েছিল, কিন্তু প্রত্যেক-বারই মেয়েটি সে কথা হেসে উড়িয়ে দিয়েছে, বলেছে—"কী হবে আমার নাম শুনে? বলেছি তো, আমার নাম বিদেশিনী; কিংবা মনে করো আমি পরীর দেশের রূপকথার সেই কঙ্কাবতী, এইটুকুই শুনে খুশি হও না!"

পোস্ট-অফিসের কাছে মোড়ের মাথায় একটা ফোটো-গ্রাফারের দোকান। সেখানে জানলার ধারে সাজানো রয়েছে অনেক রকম চেহারার ছবি। একজন সৈন্যাধ্যক্ষের ফোটো রয়েছে, তার কপালটা খাটো, গালভরা চাপদাড়ি, চোখ দুটো ড্যাব্ডেবে, প্রশস্ত বুকের ওপর অসংখ্য মেডেল আর ব্যাজ ঝুলছে। অনেকক্ষণ পর্যন্ত ও সেই ফোটোর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কত বাজে, কত তুচ্ছ,—জীবনধারণের এই সব অনাবশ্যক আড়ম্বর, কি নিছক পাগলের মতো ঐ পাগলামি! গতানুগতিক জীবনের এই সব নকল জিনিস কত

যে হাস্যকর কত যে নগণ্য। মনে হয়, যখন বুকে এসে লাগে আসল ঢেউএর ধাক্কা,—হাঁ ধাকাই তো, গভীর প্রেমের, বিরাট আনন্দের ধাক্কা, যাকে সে বলেছিল সর্দিগরমি লাগা, তার মানে। কি এখন ও বেশ মর্মেমর্মে বুঝতে পেরেছে।···আর একটা ফোটো রয়েছে এক নব দম্পতির, বরটি ফিটফাট কোট আঁটা, সাদা টাই পরা, চুলগুলো ছোট ক'রে ছাঁটা, যেন আড়ষ্ট হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে জমকালো পোষাক-পরা কনেটির হাত ধরে।···আরো একটা ছবি রয়েছে এক কলেজে-পড়া চালিয়াত মেয়ের, মাথার পিছন-দিকে হেলিয়ে পরেছে একটা কলেজের টুপি।

এই সব অচেনা মানুষ, দেখলে মনে হয় এদের মনে কোনো কষ্টই নেই, ভাবতেও ওর ঈর্ষা হয়। পথের দিকে চেয়ে চেয়ে আবার ও ভাবতে লাগলো—"এখন আমি কি করি? কোথায় যাই?" কঠিন প্রশ্ন, কোনো উত্তর পায় না, মনে প্রাণে এই তার মহা সমস্যা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।···

রাজপথ জনশূন্য। বাড়িগুলো দেখতে প্রায় একই রকম, মধ্যবিত্ত লোকেদের দোতলা সাদাসিধা বাড়ি, সঙ্গে খানিকটা ক'রে বাগানও আছে, কিন্তু সবই প্রাণহীন। ফুটপাথের ওপর একপুরু ধূলো জমেছে। রোদ হাসছে, কিন্তু এ হাসির কোনো অর্থ নেই; প্রচণ্ড রোদের তাপে চারিদিক তেতে উঠেছে, মুখ

তুলে চাওয়া যায় না। আকাশ পরিষ্কার, মেঘশূন্য, রাস্তাটা ওঠানামা করতে করতে বহুদূর অগ্রসর হ'য়ে ধূসর দিগন্তে গিয়ে বিলীন হয়েছে। দেখতে দেখতে মনে হোলো যেন ইটালির দক্ষিণ সমুদ্রতীরবর্তী দেশগুলোর সঙ্গে কোথায় এর মিল আছে; হঠাৎ মনে হোলো সেই আনাপির কথা। ঐ জায়গার নামটির সঙ্গে সঙ্গে আবার সব কথাই মনে পড়লো, আর ওর দাঁড়িয়ে থাকা সহ্য হোলো না। চোখ নামিয়ে ঘাড় হেঁট ক'রে একদৃষ্টে শুধু ফুটপাথের দিকে চেয়ে, পায়ে পায়ে জড়িয়ে টলতে টলতে কোনোরকমে আবার ও ফিরে চলল হোটেলের দিকে।

হোটেলে ফিরলো দারুণ অবসাদ নিয়ে, যেন সারাদিন দুরন্ত সাহারায় কিংবা তুরস্কের কোন মরুভূমিতে টহল দিয়ে ফিরছে। কোনোরকমে আবার সেই শূন্য ঘরটার মধ্যে গিয়ে হাজির হোলো। ইতিমধ্যে সেখানে বিছানাপত্রের নতুন গোছগাছ করা হয়েছে। মেয়েটির আর কোনো চিহ্নই সেখানে নেই,—কেবল টেবিলের উপর পড়ে রয়েছে একটি মাথার কাঁটা, সে ভুলে হয়তো ফেলে গিয়েছে। কোট খুলে রেখে ও একবার আয়নার দিকে চাইলে। আয়নায় প্রতিফলিত রয়েছে একজন সামান্য লেফ্‌টেনান্টের মুখচ্ছবি, রোদের তাপে কপালে কালি পড়ে গেছে, গোঁফটা মলিন, চোখ দুটো ঘোলাটে, চুল-গুলো বিপর্যস্ত, মুখভাব উৎকণ্ঠিত। ঐ চেহারা নিয়ে গলায় কলার এঁটে পাতলা সাদা শার্ট পরে আয়নার মধ্যে হতাশভাবে

দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি অল্পবয়সী নিঃসঙ্গ যুবক, যেন নিতান্ত অসহায়, নিতান্তই অসুখী। আয়না থেকে সরে ও খাটের ওপর সটান চিৎ হ'য়ে শুয়ে পড়লো, ধূলোমাখা জুতাসুদ্ধ পা দুটো রাখলে খাটের রেলিংএর ধারে। জানলাগুলো খোলা হয়েছে, মাঝে মাঝে গরম হাওয়া দিচ্ছে, তার সঙ্গে ভেসে আসছে ভল্‌গা নদীর তীরবর্তী শুষ্ক প্রান্তরের মেঠো গন্ধ। হাত দুটির উপর মাথা রেখে শুয়ে ও শূন্যদৃষ্টিতে উপর দিকে চেয়ে রইলো। মনে মনে দেখতে লাগলো একটা অস্পষ্ট ছবি,—ইটালির দক্ষিণ সমুদ্রসৈকতে রোদ ওঠা, সমুদ্রতরঙ্গ, আনাপি। তারপর দেখা দিল একটা অলৌকিক শহর, সাধারণ কোনো পার্থিব শহরের মতো মোটেই দেখতে নয়,—যে শহরে বাস করে সেই মেয়েটি, যেখানে এতক্ষণে হয়তো সে পৌঁছে গেছে। ফিরে ফিরে তখন আত্মহত্যার কথা ওর মনে উদয় হ'তে লাগলো। চোখ দুটো বোজাবামাত্র উষ্ণ অশ্রু উপ্‌চে বেরিয়ে এলো, চোখের মধ্যে জ্বালা ক'রে উঠলো।

শুয়ে শুয়ে কখন এক সময় ও ঘুমিয়ে পড়লো। যখন উঠলো তখন চেয়ে দেখলে রোদের রং হল্‌দে, সন্ধ্যা হ'য়ে এসেছে। বাতাস একদম বন্ধ, ঘরটা যেন জ্বলন্ত চুলির মতো গরম। চেতনা হবার সঙ্গে সঙ্গে মনে হোলো আজকের দিনটা থেকে কালকের দিনটা ছিল যেন দশ বছর তফাতে। অলস ভাবে ও উঠলো, অলসভাবে মুখহাত ধুলে, ঘণ্টা বাজিয়ে হুকুম

দিলে চা আর হিসাবের বিল আনতে, তারপর অনেকক্ষণ পর্যন্ত বসে বসে শুধু চা খেলে লেবুর রস মিশিয়ে। চা পান শেষ ক'রে বললে একটা গাড়ি ভাড়া ক'রে ওর জিনিসগুলো নামিয়ে নিয়ে যেতে।

গাড়িতে উঠে হোটেলের চাকরটাকে ও পাঁচ টাকা বক্‌শিশ দিলে। তাই দেখে গাড়োয়ানটা লাগাম টেনে ধরে হাসতে হাসতে বললে—"হুজুর, আমিই সেই কাল রাত্রে আপনাকে জাহাজ থেকে এনেছিলুম, আবার আমিই নিয়ে যাচ্ছি।"

জেটিতে যখন পৌঁছলো তখন অন্ধকার হ'য়ে এসেছে, ভল্‌গা নদী আকাশের গাঢ় নীল চন্দ্রাতপে ঢাকা। নদীর জলের উপর এদিকে ওদিকে নানাবর্ণের অসংখ্য আলো মিট্‌মিট্‌ ক'রে জ্বলতে শুরু করেছে, জাহাজের মাস্তুলের মাথায় মাথায় তীব্র আলোক-বিন্দু।

বক্‌শিশলোভী গাড়োয়ানটা বললে—"দেখুন ঠিক সময়ে পৌঁছে দিয়েছি হুজুর।"

লেফ্‌টেনাণ্ট তাকেও পাঁচ টাকা বকশিশ দিয়ে টিকিট কিনে জেটির উপর গিয়ে দাঁড়ালো। কাল যেমন হয়েছিল ঠিক তেমনিভাবেই জাহাজ এসে জেটির গায়ে লেগে একবার ধাক্কা খেলে, এই ধাক্কায় ঠিক তেমনি ভাবেই ওর পা টলে মাথাটা একটু ঘুরে গেল, চাকার আলোড়নে উৎক্ষিপ্ত নদীর জলে ফেনা উঠতে লাগলো।......

জাহাজের চারিদিক আলোয় আলোয় প্রদীপ্ত, যাত্রীর ভিড়ে খাদ্যের সুঘ্রাণে আলাপে আলোচনায় হাসিখুশিতে মুখরিত। কয়েক মিনিট পরেই জাহাজ দ্রুতবেগে অগ্রসর হ'য়ে চললো সেই দিক দিয়েই, যেদিকে সকালের জাহাজখানা মেয়েটিকে নিয়ে চলে গেছে।

গ্রীষ্ম-সন্ধ্যার শেষ আভা ধীরে ধীরে দিগন্তে বিলীন হ'য়ে যেতে লাগলো ; নদীর উপর প্রতিফলিত হ'তে লাগলো সূর্যাস্ত-পরের শেষ বর্ণবৈচিত্র্যগুলি, বীচিবিক্ষুব্ধ জলের উপর ভেসে উঠতে লাগলো এক এক খণ্ড ক্ষণস্থায়ী ঔজ্জ্বল্য। দূরে দূরে বিক্ষিপ্ত আলোকবিন্দুগুলি দ্রুত পার হ'য়ে যাচ্ছে, যেন ভেসে ভেসে তারা পিছনদিকে সরে যাচ্ছে।

ডেকের এক কোণে লেফ্‌টেনাণ্ট একা রইল বসে। ওর বয়স যেন একদিনে দশটা বছর বেড়ে গেছে।

গৌতমী

পুরাকালে যে গৌতমী আপন অজ্ঞাতসারে বহু ঘটনাচক্রের ধাপে ধাপে অগ্রসর হ'য়ে একদিন ভগবান বুদ্ধের অপার করুণার ছায়াতলে পরম আশ্রয় লাভ করেছিল, এ সেই সার্থকজন্মা গৌতমীর প্রেমের কাহিনী।

এ কাহিনী বড় হৃদয়স্পর্শী, অথচ সংক্ষিপ্ত এবং অনাড়ম্বর।

এই ভাবে গল্পটি শোনা যায়—

হিমালয়ের মনোরম উপত্যকায় বিস্তীর্ণ এক জনাকীর্ণ পল্লীতে একটি দরিদ্র ভদ্রবংশে গৌতমীর জন্ম হয়েছিল।

গৌতমী দীর্ঘদেহা তন্বী, শ্যামবর্ণা, হাস্যমুখী, আর মনটি অতি সরল। প্রথম দৃষ্টিতে দেখলেই তাকে মনে হোতো খুব কৃশাঙ্গী,—তাই বিদ্রূপ ক'রে লোকে তার নাম দিয়েছিল 'কৃশা-গোতমী'। কিন্তু সে তাতে মোটে অসন্তুষ্ট হোতো না। তার ভালমানুষির সুযোগ নিয়ে যে যাই বলুক, অম্লানবদনে সকলের কথা সে শুনতো এবং সকলের আদেশ পালন করতো। এই ছিল তার স্বভাব, কারো কথায় সে কখনো 'না' বলতে পারতো না। যে কাজই

করতে বলা হোক, তার মুখে সর্বদা সেই একই উত্তর—"আচ্ছা, এখনই ক'রে দিচ্ছি।"

কেউ যেন ভুল বুঝবেন না, গৌতমীকে চতুর কিংবা বুদ্ধিমতী মেয়ে বলা যায় বটে, কিন্তু বোকাও বলা যায় না, কারণ নির্বোধের মতো কোনো কথা তার মুখে কখনো শোনা যায়নি। খুব অল্প কথাই সে বলতো। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অষ্টপ্রহর কিছু একটা কাজ নিয়েই সে সর্বদা ব্যস্ত থাকতো, এই কারণেই হয়তো তার কথা বলবার তেমন সুযোগ ঘটতো না। নিতান্ত সাধারণ একখানি কাপড় পরে' সে থাকতো, সর্বদাই দেখা যেতো সেই একই কাপড়ে আছে। কিন্তু সেখানি সর্বদাই পরিচ্ছন্ন ধব্‌ধবে।

একদিন গৌতমী যখন তার ভাইবোনদের কাপড় ধুতে নিয়ে গেছে নদীর ঘাটে, তখন ঐ দেশের এক তরুণ রাজপুত্র সেখানে বেড়াতে গিয়ে হঠাৎ ওকে দেখতে পেল। ওকে দেখেই সে বুঝতে পারলে যে মেয়েটি অতি নিরীহ, ওর বাপমাও নিশ্চয় খুব দরিদ্র, সুতরাং সম্ভোগের জন্য ওকে গ্রহণ করলে ও সহজেই বশ হ'য়ে যাবে, এবং ওর বাপমায়ের পক্ষ থেকেও কোনো প্রতিবন্ধকতা ঘটবার আশঙ্কা নেই।

রাজপুত্র ভেবে দেখলে,—"ওঁর বাপমা বরং বলবে, এই বেশ হয়েছে। তারা বলবে, মেয়ে তো একে অতি নির্বোধ, তার উপর দেখতেও তেমন সুন্দরী নয়, উঁচু ঘরের মেয়ের মতো

মোটেই দেখায় না, বরং দাসীকন্যার মতোই দেখায়, সুতরাং ওর বিয়ে দেওয়াই মুশকিল হোতো। অবিবাহিত অবস্থায় একদিন হয়তো কোনো মন্দলোকের কবলে পড়ে একটা অনর্থ ঘটে যেতো, গৌতমী কখনো কাউকে প্রত্যাখ্যান করতে পর্যন্ত জানে না। রাজপুত্রের মনে যখন দয়া হয়েছে তখন সে খুবই ভাল কথা, এর পর গৌতমীর সন্তানাদি হ'লে যদি রাজপুত্র তাদের ভরণপোষণের ভারটুকু নেয় তা' হলেই যথেষ্ট।"

আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যখন রাজপুত্র এই সব কথা ভাবছে, ততক্ষণে গৌতমীর কাপড়গুলি ধোওয়া হ'য়ে গেছে, সেগুলি নিংড়ে নিয়ে সে একপাশে রেখে দিলে। তারপর অল্প জলের মধ্যে গিয়ে সে হাঁটু মুড়ে উবু হ'য়ে বসলো, নিজের কাপড়খানি কাচবার জন্যে খুলে ফেলে গামছা দিয়ে বুকটা ঢেকে নিলে, কবরী খুলে দীর্ঘ কালো চুলের রাশি এলিয়ে দিলে, মুক্তার মতো দাঁতগুলি আঙুল দিয়ে মেজে পরিষ্কার ক'রে নিলে, এবং গামছাখানি দিয়ে ধীরে ধীরে নিজের অঙ্গমার্জনা করতেলাগলো। সে জানতেও পারলে না যে বাঁশবনের আড়াল থেকে রাজপুত্র সমস্তই লক্ষ্য করছে।

কিছুক্ষণ পরেই রাজপুত্র আড়াল থেকে বেরিয়ে হাসতে হাসতে ওর কাছে গিয়ে বললে—"গৌতমী, কে বলে তুমি কৃশাঙ্গী, কে নাম রেখেছে তোমার কিশা-গোতমী? আমি তো দেখছি সে কথা একেবারে মিথ্যা। তোমার এই দীর্ঘ

দেহখানি সামান্য একখানা কাপড় দিয়ে সর্বদা ঢেকে রাখো, তাই লোকে বুঝতে পারে না কত সুন্দর তোমার রূপ। দেখ গৌতমী, আমি শুনেছি তুমি সকলেরই বাধ্য, যে যা বলে তাই শোনো। আজ আমার কথাটিতেও তুমি বাধ্য হও, আমি যা চাই সে বিষয়ে তুমি প্রত্যাখ্যান কোরো না। এই দুপুরবেলা এখানে জনপ্রাণী কেউ নেই, আমাদের গোপন মিলনের কথা কেউ জানতে পারবে না।"

লজ্জায় মাথাটি নীচু ক'রে গৌতমী শুনে যেতে লাগলো,— রাজপুত্র অনেক অনুনয়-বিনয় করছে, বারবার শপথ ক'রে বলছে তার প্রস্তাব অবৈধ কিংবা অসম্মানজনক হবে না। কিছুক্ষণ পর্যন্ত চুপ ক'রে থেকে অবশেষে সে মৃদুস্বরে বললে—"প্রভু, আপনার যেমন ইচ্ছা তাই হোক।"

গৌতমীর অঙ্গসান্নিধ্য লাভ ক'রে রাজপুত্র দেখলে যে তফাৎ থেকে যেমন মনে হয় তার চেয়েও বস্তুত সে অনেক সুন্দর। তার কালো চোখ দুটি যদিও কোনোরকমের ভাবপ্রকাশ করেনা, নির্বোধের মতো নিত্য কেবল ফ্যাল্‌ফ্যাল্ ক'রেই চেয়ে থাকে, তবু ওর মধ্যে যথেষ্ট মাদকতা আছে।

এর পর থেকে ঐ নদীর ধারে বাঁশবনের মধ্যে নিত্যই ওদের দেখাসাক্ষাৎ হ'তে লাগলো। রাজপুত্র যখনই তাকে ওখানে যেতে বলতো, সে ঠিক সময়টিতে গিয়ে উপস্থিত হোতো, কখনো তার ব্যতিক্রম ঘটতো না। এইভাবে দেহের

সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং সহজ হ'য়ে গেলেও গৌতমীর বিনম্র আচরণের কোনো পরিবর্তন দেখা গেল না, তার রূপের আকর্ষণও কিছু কমলো না। মৃদুস্বরে তার মুখের সামান্য একটু কথা শুনলেই রাজপুত্র পরম পুলকিত হ'য়ে উঠতো।

কিছুকাল এইভাবে কাটবার পর গৌতমী গর্ভবতী হোলো। রাজপুত্র তখন তাকে রক্ষিতা-স্বরূপ গ্রহণ ক'রে তার তুচ্ছ সম্পত্তিগুলি ও ভাঙা পেটরাটি সমেত নিয়ে গিয়ে নিজের ঐশ্বর্যমণ্ডিত রাজপ্রাসাদের মধ্যে স্থান দিয়ে রাখলে। গৌতমী সেখানে গিয়ে তার প্রত্যাশিত প্রসবের দিনটির জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলো।

প্রসবের সময় যখন আসন্ন, তখন এক অন্তঃপুরচারিণী ভর্তৃকা এসে তাকে উপদেশ দিয়ে বললে—"গৌতমী, প্রসবের সময় বধূরা সকলেই নিজের পিত্রালয়ে যায়, এই আমাদের নিয়ম। তোমারও তাই যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তুমি তো বিবাহিতা স্ত্রী নও, রাজপুত্রের রক্ষিতা মাত্র। সেইজন্যেই তুমি সেখানে আর যেতে পারবে না। কিন্তু এ সময় এখানে থেকে এখানকার যাতে কোনোরকম নিন্দা হয় তাও তোমার করা উচিত নয়, এই কথাটি ভেবে দেখো।"

বিনাবাক্যে তখন গৌতমী তাকে ভূমিষ্ঠ হ'য়ে প্রণাম করলে এবং তৎক্ষণাৎ উঠে অন্তঃপুর ত্যাগ ক'রে তোরণদ্বার পার হ'য়ে প্রাসাদের বাইরে বেরিয়ে চলে গেল।

প্রাসাদের পরিখার সেতু পার হ'য়ে কিছুদূর গিয়ে গৌতমী দেখতে পেলে, অতি বৃদ্ধ একজন অন্ধ ভিক্ষু ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে পথের ধারে গাছতলায় বসে আছে; সামান্য একটু জীর্ণ কটিবাস মাত্র তার পরণে, প্রখর রোদে তার অনাবৃত লোল দেহ যেন ঝল্সে যাচ্ছে, কিন্তু তবু সে নিশ্চল হ'য়ে বসে আছে।

গৌতমীর পায়ের শব্দ শুনেই অন্ধ ওর দিকে মুখ ফিরিয়ে অতি মধুর স্মিতহাস্যে পরম স্নেহপূর্ণ স্বরে ওকে সম্বোধন করলে; সেই স্মিতহাসি সাধারণ মানুষের নয়, কেবল সর্বজ্ঞ ব্যক্তিরাই তেমন অভয়দায়ক অদ্ভুত হাসি হাসতে পারে।

বৃদ্ধ বললে—"গৌতমী, আমি চোখে না দেখেও তোমার আগমনবার্তা অনুভব করছি। গৌতমী, তোমার এই পথযাত্রা নির্বিঘ্ন হোক, সার্থক হোক।"

বৃদ্ধের পায়ের ধূলা মাথায় নিয়ে গৌতমী অগ্রসর হ'য়ে চলল। বহুদূর পায়ে হেঁটে অবশেষে এক রৌদ্রতপ্ত আমের বনের মধ্যে ঢুকে অকালে সে একটি সন্তান প্রসব করলে।

অনেক দুঃখের পর এই সন্তানটিকে পেয়ে তার চোখ দিয়ে আনন্দের অশ্রুধারা বইল। কিছুক্ষণ সেখানে বিশ্রাম নিয়ে ছেলেটিকে কোলে তুলে হৃষ্টচিত্তে আবার সে রাজপ্রাসাদে ফিরে গেল।

অতঃপর পুত্রবাৎসল্যে সমস্ত অন্তরটি তার ভরে গেল, দিনরাত স্নেহের আবেশেই সে তন্ময় হ'য়ে রইল। অপলক নেত্রে শিশুর

দিকে চেয়ে, তার মুখের ঘ্রাণ নিয়ে, তার অঙ্গ স্পর্শ ক'রে, বুকের মধ্যে তাকে জড়িয়ে ধরে,—অতি নিগূঢ়ভাবে সে ওর অপূর্ব কমনীয়তাটুকু উপভোগ করতে লাগলো। দিনে দিনে শিশুর বুদ্ধি-চেতনা কেমন ধীরে ধীরে বিকশিত হ'য়ে উঠছে তাই হোলো গৌতমীর একমাত্র লক্ষ্যের বিষয়।

কিন্তু রাজপুত্র? সে একবারও গৌতমীকে ডেকে বলেনি —"ফিরে এসো তুমি আমার হৃদয়ে।" এক সময়ে যদিও সেই গৌতমী ছিল অত্যন্তই প্রিয়, যদিও একদিন সমারোহ ক'রে রাজপুত্র তাকে রাজপুরীতে এনেছিল, বধুর বেশে সাজিয়ে কেশদাম বেণীসম্বন্ধ ক'রে মুখে কুঙ্কুমশোভা দিয়ে কপোলে তিলকাঙ্কণ রচনা ক'রে অতি সমাদরে তাকে পুষ্পযানে উঠিয়ে এনে যদিও একদিন রাজপ্রাসাদে তাকে গৌরবের স্থানে অধিষ্ঠিত করেছিল, কিন্তু এখন যখন সন্তান হওয়াতে ওদের সম্বন্ধ বরং আরো ঘনিষ্ঠ হ'য়ে উঠবার কথা, তখন রাজপুত্রের সে পূর্বপ্রীতি কোথায় গেল?

সন্তান প্রসবের পর ফিরে এসে রাজপুত্রের আকস্মিক পরিবর্তন দেখে তার সমস্ত অবহেলাই সে নির্বিরোধে মেনে নিলে, এবং এমনভাবে তার দৃষ্টিপথের অন্তরালে নিজেই সরে রইল, যাতে রাজপুত্র কখনো তাকে অতর্কিতে দেখতে পেয়ে নিজেকে অপরাধী ভেবে কোনো দ্বিধা কিংবা মনোকষ্ট না পায়।

রাজপ্রাসাদের সীমানার মধ্যেই সে রইল গিয়ে এক প্রান্তে

অন্তঃপুরের সরোবরতীরে একখানি পরিত্যক্ত কুটীরে। যে সকল পোষা হাঁসের পাল ঐ সরোবরের জলে ভেসে বেড়ায়, যাদের কেউ খোঁজখবর নেয় না, তাদের নিত্য দেখাশোনা করা এবং খেতে দেবার ভার নিয়ে ওর সময় কাটতে লাগলো।

কিছুকাল এমনিভাবে একরকম শান্তিতেই কাটলো। এই সামান্য শান্তিটুকুর পরেও আবার যে এক মহাদুঃখ তার ভাগ্যে রয়েছে, আপন অজ্ঞাতসারে ঐটুকু বিরতির মধ্যে সে তারই জন্যে হয়তো ভিতরে ভিতরে প্রস্তুত হচ্ছিল। ওর সেই মহাদুঃখ শীঘ্রই একদিন এসে উপস্থিত হোলো। অবশেষে সেই সন্তান-বিয়োগের চরম দুঃখই যে একদিন তাকে পরম মুক্তিলাভের পথ দেখিয়ে দিলে, পীতবাস ভিক্ষুদের দলে তার প্রকৃত শান্তির স্থান নির্দেশ ক'রে দিলে, এই কাহিনী সকলেই জানে।

বন্ধন যে ছিঁড়তে পারলে এবং অন্তরে যে অচঞ্চল হ'তে পারলে, জীবনে সেই ধন্য।

উচ্চ আকাশে কেবল পাখীরাই উড়তে পারে, ডানা দুটি ছাড়া তাদের বোঝা বইবার কিছুই নেই। জগতে আপন বলতে যাদের কোনো কিছু বোঝা নেই তারাই আনন্দলোকের সর্বোচ্চ স্তরে উঠে যায়।

মৃত্যু

জগদীশ্বরের জয় হোক। সর্বকালেই তিনি মঙ্গল এবং করুণার আকর।...

এটি এক মিশরদেশীয় মহাপুরুষের মৃত্যুর কাহিনী,—ঈশ্বর তাঁর আত্মার শান্তি করুন। অবিশ্বাসীরা যাতে ঈশ্বরের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে সেইজন্যই এই গল্পটি বলা হয়। তারা বলে,—"ঈশ্বরকে চোখে কখনই দেখিনি, এখনও দেখা যাচ্ছে না।" কিন্তু পেঁচা যে দিনের আলো চোখে দেখতে পায় না, তাতে সূর্যের কোনো অপরাধ নেই। মানুষের হৃদয় যখন আপনা থেকেই একটা বিশ্বাস করবার মতো অবলম্বন চায় তখন শুধু পেঁচার পরামর্শ নিয়ে লাভ কি? বাসুকীর হয়তো কোনো অস্তিত্ব নেই, কিন্তু তবু বাসুকীর আশ্রয়ে আমরা বাস করছি এ কথা কল্পনা করাতে কোনো ক্ষতি নেই। কিন্তু সে কথা যাক, বিধাতার করুণা স্বতঃপ্রমাণ রূপেই আবহমানকাল বর্ষিত হচ্ছে, সুতরাং ঐ নিয়ে কল্পনার কিছু প্রয়োজনই নেই।

যেমন শৃগালেরা সিংহের পিছুপিছু যায়, কারণ সিংহই জানে শিকার কোথায় মিলবে ; যেমন শিকারকে আয়ত্ত ক'রে সিংহের আগেভোগ হ'য়ে গেলে তখন শৃগালের দল তার উচ্ছিষ্ট পায়, আর তাতেই তাদের প্রাণধারণ হয় ;—তেমনি এই হিব্রুজাতির মহাপুরুষ যেদিন মিশর ত্যাগ ক'রে চলে যান সেদিন সমগ্র হিব্রুজাতিও তাঁর পিছুপিছু সে দেশ ত্যাগ ক'রে গিয়েছিল এবং তাতে তাদের ভালই হয়েছিল। যে মহা দায়িত্ব তিনি নিজের ঘাড়ে নিয়ে এই কাজটি করেছিলেন বিধাতার অনুগ্রহে তিনি তা শেষ পর্যন্ত রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

এই মহাপুরুষ জন্মেছিলেন ঐশ্বর্যবানের ঘরে। শৈশবকালে ইনি বিলাসের মধ্যে থেকে নিদ্রা-জাগরণের সুখ ও আদরযত্ন যথেষ্টই পেয়েছেন। সুন্দরী রাজার ঝিয়ারী তাঁকে কোলের মধ্যে নিয়ে কতই দোলা দিয়েছে ; সে সামান্যা সুন্দরী নয়, সুডোল সুগোল সেই কন্যার বাহু ছিল সর্পদেহের মতো চিক্কণ, রৌদ্রতাপে সুপক্ক ফল যেমন উত্তপ্ত হ'য়ে ওঠে তেমনি ছিল তার কমনীয় বাহুর উষ্ণতা। জ্বলন্ত দুটি সুনিবিড় কৃষ্ণতারকাযুক্ত চোখ নিয়ে কৌতূহলের সঙ্গে চেয়ে থাকতো সে তাঁর মুখের দিকে,—নিজের বুকের মধ্যে চেপে ধরে আবেগভরে তাঁকে যখন চুম্বন দিত, সেই নিবিড় আলিঙ্গনের চাপে তাঁর নিশ্বাসরোধের উপক্রম হোতো। ছেলেবেলাকার এই সব কাহিনী শুনলে অনেকেই মনে মনে ভাবে—"আহা, তখন শিশু না হ'য়ে যদি

আমি যুবা হতুম!" কিন্তু অসময়ে লোভ ক'রে কিছু লাভ নেই, সব জিনিসেরই একটা নির্দিষ্টকাল আছে।

প্রথম বয়সে তিনি ছিলেন একজন রাজকর্মচারী, মিশরের ফারাও তাঁকে দিয়েছিলেন রাজনিদর্শনযুক্ত শিলাঙ্গুরী, উচ্চ রাজ-সভাসদের পরিচ্ছদ ছিল তাঁর পরিধেয়। প্রত্যহ যখন প্রভাতকাল অতিক্রম ক'রে রৌদ্রতেজ প্রখর হ'য়ে ওঠে, রাজপথের দোকানে দোকানে যখন জাফরাণ-সংযুক্ত মশলাপাতির সুঘ্রাণ পথিকদের প্রলুব্ধ করে, নদীর দিক থেকে যখন মেঠো হাওয়ার গন্ধ আসে এবং ক্ষণে ক্ষণে গৃহস্থের রান্নাঘর থেকে অগ্নিদগ্ধ গোধূমের পরিচিত আঘ্রাণ পাওয়া যায়, বিশাল নদীর জলে যখন ভারবাহী নৌকাগুলো মস্ত মস্ত সাদা পাল তুলে দিয়ে হাওয়ার বশে জোড়ে জোড়ে মন্থরগতিতে ভেসে চলে যায়—আর ক্বচিৎ দু একটা লোমশূন্য মহিষ ঠাণ্ডা পাঁকের মধ্যে গা ডুবিয়ে মাথা তুলে অলস-দৃষ্টিতে সেই দিকে চেয়ে থাকে—এমনি সময় ঐ ক্ষমতাদৃপ্ত যুবক সুসজ্জিত অশ্বরথে চড়ে মাঠে মাঠে চাষের কাজের তদারক ক'রে বেড়াতেন, কাজে কেউ ফাঁকি দিচ্ছে দেখলেই তাকে বেত মেরে প্রবল শাসন করতেন, তীব্র ভাষায় গালাগালি দিতেন, তারপর খানিকটা ঘুরে ফিরে যথেষ্ট কর্তব্য পালন করেছেন ভেবে নারিকেল কুঞ্জের ছায়াতে গিয়ে আরামে নিদ্রা দিতেন।

দশ বছর পর্যন্ত তাঁর বিবাহিত জীবন বেশ সুখেই কাটে। উচ্চবংশের এক ধনীর মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। রাত্রি-

কালে নিত্য তিনি এই সুন্দরী স্ত্রীর মধুর সঙ্গসুখ লাভ করতেন, আর দিনের বেলা প্রচুর পানভোজন করে অধীনস্থ লোকদের উপর কর্তৃত্ব ফলিয়ে আনন্দে সময় কাটাতেন। মর্মরগৃহের বিলাস, নদীতীরের শীতল বাতাস, আর বাগানের ফোটাফুলের সুগন্ধ, সমস্তই তিনি উপভোগ করতে জানতেন। আত্মীয়-স্বজন দাসদাসী ছিল তাঁর প্রচুর, গৃহস্থালি জমজমাট, লোকের কাছে মানসম্ভ্রমও যথেষ্ট, এই নিয়ে এককালে মনে মনে যথেষ্ট গর্বও অনুভব করেছেন। সুতরাং মোটের উপর নিশ্চিন্ত আরামেই তিনি ছিলেন, যেমন আরো অনেকেই থাকে। কিন্তু এর মধ্যেই এক অদৃশ্য হস্ত মাঝে মাঝে তাঁর জীবন-ধনুকের ছিলা ধরে টানছিল, সত্যের সুতীক্ষ্ণ বাণটি যোজনা ক'রে ছেড়ে দেবার পূর্বে ধনুর্গুণ টেনে টেনে পরীক্ষা ক'রে দেখছিল শর-ক্ষেপের প্রচণ্ড বেগ সে ধারণ করতে পারবে কি না।

প্রথমে যখন মনে অশান্তি দেখা দিল, বিকাশোন্মুখ হৃদয়ের কি এক অব্যক্ত বেদনায় যখন অস্থির হ'য়ে উঠলেন, তখন তাকে শান্ত করবার জন্যে মিশরের সুবিশাল জ্ঞানভাণ্ডারে ঢুকে তিনি জ্ঞান সঞ্চয়ের নীরব সাধনায় নিমগ্ন হলেন। এমনিভাবে কেটে গেল আরো দশ বছর। ঘর তোলবার আগে যেমন মাটির নীচে গভীর ভিত্তি করা চাই, বাণী প্রকাশের আগে তেমনি মনে মনে গভীর চিন্তা করা চাই। দশ বছরের চিন্তার পর একদিন তিনি দেশের ধর্মযাচকদের ডেকে বললেন,—"ওরে

নির্বোধের দল; সূর্যকে তোঁরা পূজা করিস, সূর্যই কি তোদের ঈশ্বর? যারা মূর্খ হয় তারা ঐ রৌদ্রের তেজ দেখে সূর্যের দিকে দুই হাত তুলে ঈশ্বরজ্ঞানে তাকেই পূজা করে, কিন্তু তারও উপরে যে একজন বিধাতা আছেন। সূর্য কখনো ঈশ্বর নয়, তিনিই ঈশ্বর। ঈশ্বরকে সূর্যের মতো চোখে দেখা সম্ভব নয়; কেউই তাঁকে দেখতে পায় না। ঈশ্বর জ্ঞানবুদ্ধির অগম্য, কেবল অনুভূতির দ্বারাই তিনি গ্রাহ্য। ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়; তাঁর কোনো সন্তান-সন্ততি কিংবা সাঙ্গোপাঙ্গ থাকতে পারে না।"

ফারাওএর কানে পৌঁছলো এই নতুন বার্তা। শুনেই ফারাও ক্রোধে দারুণ ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠলো, যেমন অহেতুক অতিশয় ক্ষিপ্ত হ'য়ে ওঠে বৃষরাজ। ফারাও বললে—"কার এত বড় স্পর্ধা যে নতুন ধর্ম নিয়ে আমার রাজ্যে প্রাণধারণ করে, আমার অনুমতি না নিয়ে আমারই রাজ্যে নতুন ধর্মের কথা প্রচার করে? তার হাতে নেই হীরার আংটি, গলায় নেই মণিমুক্তার কণ্ঠহার, আমারই সে নগণ্য একটা ভৃত্য। ঝাড়গোষ্ঠি সমেত তাকে ভীষণ শাস্তি পেতে হবে। আমি বিদ্যুতের মতো জ্বলে উঠেছি, বজ্রের মতো তাকে পুড়িয়ে মারবো।"

কিন্তু মহাপুরুষ এতে ভয় পেলেন না। যেমন খুব উঁচু পাহাড়ে বন্ধুর পথে উঠতে হ'লে পথিক আবেগকে থেকে বক্ষ সঞ্চয় ক'রে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে, মহাপুরুষও তেমনিভাবে

নিজের শক্তি বুঝে নির্ভীক হৃদয়ে নিজের নির্দিষ্ট পথে অগ্রসর হ'য়ে গেলেন। ফারাওএর রাজ্য ত্যাগ ক'রে চলে গিয়ে তিনি এক মরুভূমিতে স্বতন্ত্র রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করলেন।

তখনকার দিনে এ বড় সামান্য কথা নয়। কিন্তু মৃগনাভির সুঘ্রাণ এমনিতেই মেলে না,—তাকে চূর্ণবিচূর্ণ ক'রে ফেলতে হয়, ধূপে লাগিয়ে তাতে আগুন জ্বালিয়ে দিতে হয়, তবেই ছোটে তার সৌরভ। মুক্তা খুঁজতে গিয়ে ডুবুরি যদি সমুদ্রতলে ডুবে শ্বাসবন্ধ হ'য়ে মরবার ভয় করে, তাহ'লে সে একটাও মুক্তা তুলে আনতে পারে না। মন্দির গড়বার জন্যে প্রয়োজন হয়েছিল একখানি অত্যন্ত ভারী পাথর বইবার, মহাপুরুষের প্রতি আদেশ হোলো সেই গুরুভার পাথরখানি বহন ক'রে নিয়ে যেতে হবে, অনেক ব্যথা লাগলেও তিনি প্রাণপন শক্তিতে সেখানি নিজের স্কন্ধে তুলে নিলেন। তারপর একদিন নয়, দুদিন নয়, দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধ'রে সেই মরুভূমিতে তিনি আপন আনন্দে ঐ গুরুভার অবলীলাক্রমে বহন ক'রে নিয়ে চললেন, কারণ নিশ্চিত জানতেন তিনি যে স্বয়ং ঈশ্বরের হুকুম পালন করছেন, কোনো ফারাওএর নয়। অবশেষে নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে ঘাড় থেকে ভার নামিয়ে দীর্ঘকাল পরে তিনি কপালের ঘাম মুছলেন। তখন তিনি স্কন্ধে ব্যথা অনুভব করলেন, দুর্বলতায় তাঁর হাত-পা কাঁপতে লাগলো।

এবার একদিন তাঁর মৃত্যুর সময় এসে উপস্থিত হোলো।

দিব্যজ্ঞানের দ্বারা ঈশ্বরকে তিনি জেনেছেন। হিব্রুদের তিনি জানিয়ে দিয়েছেন যে ঈশ্বরের কোনো অবয়ব নেই, মাটি কিংবা ধাতু কিংবা পাথর দিয়ে তাঁর প্রতিমূর্তি গড়তে চেষ্টা করা বৃথা। ওরা মোহের বশে ঈশ্বরের প্রতিমা গড়তো, বিধাতা ওদের সেই মোহ দূর করবার ভার দিয়েছিলেন মহাপুরুষের প্রতি,—সবল হস্তে তিনি ওদের মোহজাল ছিন্ন ক'রে দিলেন, সংস্কারের বিরুদ্ধে দারুণ যুদ্ধ ক'রে শেষ পর্যন্ত তিনি জয়লাভ করলেন। সেই রৌদ্রদগ্ধ বালুময় ঊষর মরুভূমির মধ্যে নির্বোধ এবং দুর্বিনীত এক হিব্রু সম্প্রদায়ের নায়ক হ'য়ে চল্লিশ বছর তিনি কাটালেন, বিধাতা চল্লিশ বছর ধ'রে তাঁকে বহু পরীক্ষা করলেন। ঐ চল্লিশ বছর যাবত তিনি রাজার মতো অখণ্ডপ্রতাপে ওদের মধ্যে বাস করলেন, কিন্তু শ্রম-জীবীরা যেমন নিজের ছেলেমেয়েদের ভরণপোষণের জন্যে সারাক্ষণ পরিশ্রম করে তেমনিভাবে তিনি ওদের জন্য কত অক্লান্ত পরিশ্রম করলেন, রাজার মতো সম্ভোগের মধ্যে না থেকে তিনি স্বেচ্ছায় দারিদ্র্য বরণ ক'রে নিলেন সামান্য মেষ-পালকের মতো,—অথচ রইলেন যোদ্ধার মতো উন্নতশির, সিংহের মতো তেজস্বী। কোমরে জড়াতেন মাত্র মৃগচর্মের একটি আচ্ছাদন, গায়ে কোনো বস্ত্র নেই, পায়ে কোনো পাদুকা নেই; রোদে বৃষ্টিতে দেহ হোলো মলিন, পা দুখানি হোলো উটের পায়ের মতো শুষ্ক আর কঠিন। যখন বৃদ্ধ হলেন তখন

সকলেই মনে করতো ইনি মানুষ নন, সাক্ষাৎ কোনো দেবতা। কিন্তু এবার একদিন তাঁরও মৃত্যুর সময় এলো।

শোনো শোনো সকলে এখন একটু মন দিয়ে শোনো, শাস্ত্রে কি কথা বলছে। শাস্ত্রে বলে—মানুষ প্রত্যেকেই জন্মেছে একই সত্যের আশ্রয়ে, তারপরে সংসারে ঢুকিয়ে বাপ মা তাদের ক'রে দিয়েছে হিব্রু কিংবা ক্রিশ্চান কিংবা অন্য কিছু। কিন্তু যারা মহাপুরুষ তারা ঐরূপ গতানুগতিক ভাবে চলে না। প্রথমে থাকে যেন তারা অন্ধের মতো; অনবরত পথ হাতড়ে বেড়ায় যতক্ষণ পর্যন্ত ঠিক পথটি না চিনতে পারে; ঊর্ধ্বমুখে উন্মুখ হ'য়ে কেবল আলোর দিকেই লক্ষ্য ক'রে থাকে, খুঁজতে থাকে কোথা থেকে আলো আসে। জীবনের সম্বন্ধেও তারা অনেক ভাবে, আবার মৃত্যুর সম্বন্ধেও অনেক ভাবে, ক্রমে শেষ পর্যন্ত দিব্যজ্ঞান লাভের দ্বারা মৃত্যুভয়কে দূর ক'রে ফেলে। তখন জীবনকেও তারা যেমন সহজে গ্রহণ করে, মৃত্যুকেও গ্রহণ করে তেমনি সহজে। সংসারে এমন লোক খুব কম নয় যারা মৃত্যু উপস্থিত হ'লে কোনো প্রতিবাদ না ক'রে সেই অবশ্যপেয় মৃত্যুরস অকুণ্ঠিতচিত্তে পান ক'রে নিতে পারে। কেউ কেউ আবার এমন কথাও বলে,—জীবনের পানীয় যেমন মধুর, মৃত্যুর পানীয়ও ঠিক তেমনি মধুর। কিন্তু তাই ব'লে জীবনকালেই মৃত্যুরসের পানপাত্র হাতে নিয়ে থাকা উচিত নয়, যে তা করে সে মূর্খ এবং ঘৃণার্হ। আবার সেও মূর্খ যে মৃত্যুর কথা একেবারে ভুলেই থাকে,—যে

ভুলে থাকে সেই চিরস্মরণীয় পরম প্রেমাস্পদের কথা, যিনি সারা বিশ্বের একচ্ছত্র অধিপতি এবং অটল রাজভক্তি যাঁর সকলের কাছে প্রাপ্য। শোনো শোনো সকলে মন দিয়ে শোনো সেই বাণী, আমাদের পূর্ববর্তী মানুষরা যে অসামান্য বাণী দিয়ে গেছেন, যা কেবল আমাদের নিজের উক্তি নয়। মানুষ হ'য়ে যেমনভাবে মানুষের কথা শুনতে হয় তেমনিভাবে তোমরা শোনো, অবহেলা না ক'রে এ কথার মনে মনে বিচার ক'রে দেখ। আমরা যা বলছি তা কারো অজানা নেই, পূর্ববর্তীদের বাণীকেই আমরা আপন ভাষায় খানিকটা আপন বাক্য মিশিয়ে নিয়ে পুনরায় বলছি। সন্দেহ দূর ক'রে যাতে সকলে সান্ত্বনা পায় সেইজন্যেই সেই পুরানো কথার পুনরুক্তি আমরা করছি।

শাস্ত্রে লেখা আছে—"আমি সর্বভূতের ঈশ্বর, তোমাদের সকলের মধ্যেই আছি, তোমাদের ধমনীতে ধমনীতে যে রক্ত-স্রোত বইছে আমি তার চেয়েও অন্তরঙ্গ হ'য়ে তোমাদের মধ্যে রয়েছি।" করুণাময় তিনি, ঠিকই তাই জানেন আমাদের পক্ষে কি ভাল আর কি মন্দ। জেনে শুনে তিনিই গড়েছেন এমনি নশ্বরভাবে যাতে একদিন আমাদের নিশ্চিত মৃত্যু আসে, তবু সেই মৃত্যুকে আমরা নিবারণ করতে চাই, তাকে মেনে নিতে পছন্দ করি না। কী মহাভ্রান্তি! শুনেছ কি ইস্কান্দারের কথা, কী ভুল ক'রে সে নরকে গিয়েছিল? সে জানতো যে নরকের দ্বারের কাছেই অমৃতের ভাণ্ড আছে, তবু সে যাবার সময়

তা পান ক'রে নিতে পারেনি।...পাখার ঝাপ্‌টা লেগে কোন বিধবার একমাত্র প্রদীপ-শিখাটি নিবে যাবে, তাই ভেবে পবন-দেবতা কখনো নিজের কাজ করতে ছাড়ে কি? মৃত্যুর দূত দরিদ্র মেষপালকের কাতর প্রার্থনাতেও কান দেয় না, রাজার তীব্র প্রতিবাদেও না। কিছুদিন সবুর কর, তোমার মাথার খুলিটার মধ্যে ঐ যে জটিল চিন্তাপূর্ণ মস্তিষ্ক রয়েছে ওটাও একদিন এই পৃথিবীর মাটিতে মিশে যাবে। যতদিন সময় আছে ততদিন কিছু হবে না, কারণ মৃত্যু লোভী নয়; কিন্তু তুমিও সেই আবু-বাকর নও, সোনা ঢেলে উৎকোচ দিয়েও তুমি মৃত্যুর কাছে অব্যাহতি পাবে না। সুতরাং এই নিয়ে অনর্থক অশান্তি পেওনা, প্রকৃত সান্ত্বনা কোথায় তার খোঁজ কর।

দুরন্ত মরুভূমিতে সার্থকভাবে দীর্ঘজীবন কাটিয়ে ঐ মহাপুরুস শেষকালে এই ভুলই করলেন, অন্তিম সময়ে ঈশ্বরের বিধানের বিরুদ্ধে যাবার প্রয়াস করলেন, তাই শাস্তিস্বরূপ তাঁর স্বর্গা-রোহণের শেষ চিহ্নটি বিলুপ্ত হোলো। বৃদ্ধ হ'য়ে যখন বুঝলেন যে এইবার তাঁর মৃত্যুর সময় আসছে, তখন বললেন তিনি—"মৃত্যুকেও আমি জয় করবো।" একদিন দুপুর বেলা মোয়াব পাহাড়ে হিব্রু পল্লীর ভিতর দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ লক্ষ্য করলেন যে পাহাড়ের সাদা পাথরের উপর তাঁর কোনো ছায়া পড়ছে না। এই দেখেই তাঁর দারুণ মস্তিষ্কবিকার ঘটবার উপক্রম হোলো। বাণের আঘাত খেয়ে জানোয়ার যে ভাবে ছুটে যায় তেমনিভাবে

তিনি ছুটে চলে গেলেন নিজের ঘরে। সেখানে গিয়েই কোমরে বেঁধে নিলেন তরবারি, অনুচরদের আদেশ দিলেন প্রচুর খাদ্য-পানীয় আনতে। তাড়াতাড়ি আকণ্ঠ পূরে তিনি সেই সমস্ত খেয়ে নিলেন। এতে কিছুক্ষণ পরে তাঁর এমন ঘন ঘন বমনোদ্রেক হ'তে লাগলো আর এমন পেটব্যথা করতে লাগলো যে মনে হোলো যেন তিনি নরকের গাছ থেকে কোনো বিষফল পেড়ে খেয়েছেন। দেখতে দেখতে মুখচোখ নীলবর্ণ হ'য়ে গেল, সর্বাঙ্গ ঘর্মাক্ত হ'য়ে উঠলো, আসন্নপ্রসবা নারীর মতো তিনি ছট্‌ফট্ করতে লাগলেন। মাটিতে গড়াগড়ি খেয়ে তখন সকলকে ডেকে চীৎকার ক'রে বললেন—"দেখ দেখ এই আমার মৃত্যু আসছে, তোমরা সকলে তরবারি নিয়ে আমাকে সাবধানে আগলে রাখো।"

প্রথম দিনটায় তিনি ক্রমাগতই এইভাবে চীৎকার করতে লাগলেন। দ্বিতীয় দিনে তাঁর যন্ত্রণা আরো বেড়ে উঠলো, তখন কাতর হ'য়ে বললেন—"আমার জন্যে শীঘ্র একজন বৈদ্য ডেকে আনো।" বৈদ্য এসেও যখন কিছু করতে পারলে না, তৃতীয় দিনেও যখন যন্ত্রণা কিছু কমলো না, তখন তিনি কাঁদতে কাঁদতে বললেন—"আর না, এবার দয়া কর, মৃত্যু যে অজেয় তা আমি স্বীকার করছি।"

তখন শ্রান্ত হ'য়ে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। সমস্ত দিন ঘুমিয়ে থেকে তাঁর যন্ত্রণা কমে গেল। ঘুম ভেঙে দেখলেন রাত হয়েছে, সুস্থ হ'য়ে তিনি ঘরের মধ্যে একা পড়ে আছেন। তখন

আবার তাঁর বাঁচবার ইচ্ছা হোলো, জীবন ত্যাগ করতে মায়া হ'তে লাগলো। এই সময় কৃষ্ণবর্ণ দুইজন স্বর্গের দূত এসে উপস্থিত হোলো, যুক্তি এবং সান্ত্বনা দিয়ে তাঁকে মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত ক'রে নিতে।

একজন বসলো ওঁর মাথার দিকে, একজন বসলো পায়ের দিকে। ওঁকে তারা বললে—"বলো তোমার মনের কথা।" কিন্তু তিনি কোনো উত্তর দিলেন না, ওদের দেখে ভয় পেয়ে চিন্তায় নিমগ্ন হ'য়ে বাইরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে রইলেন। আসন্ন মৃত্যুর অনুভূতি তাঁর অন্তরে তখনো সম্পূর্ণ জাগেনি। চারিদিক তখন নিস্তব্ধ, নির্জন, নীরন্ধ্র অন্ধকারে বাতাসের শব্দটি পর্যন্ত শোনা যায়। গুমোটভরা রাত্রিতে বাতাসও নিশ্চল, আকাশের তারাগুলি নিষ্কম্প নির্নিমেষে প্রজ্বলন্ত।

স্বর্গের দূতেরা তখন নিজেদের মধ্যেই কথাবার্তা শুরু করলে।

মাথার কাছের দূত বললে—"দেখ, ঈশ্বর সকল জীবকেই দয়া করেন।"

পায়ের কাছের দূত বললে—"কিন্তু দেখ, এই লোকটি কত যন্ত্রণা পাচ্ছে। নিশ্চয় ওর এই মৃত্যুযন্ত্রণা। এর আর কোনো অব্যাহতি নেই, একেই বলে মৃত্যু।"

মহাপুরুষ ভাবলেন, এরা তাঁকে পরীক্ষা করবার জন্যে বলছে। তিনি মনে মনে এ কথার জবাব দিলেন—"না না, এ তো মৃত্যু

নয়, এ একটা পীড়া মাত্র, জীবনের একটা শাস্তিস্বরূপ। এই কথাই ঠিক, ওদের কথা ভুল। মৃত্যু যদি হয়, তাকে প্রত্যক্ষ করবার পর আর সে কথা ভাবাও যায় না কিংবা প্রকাশ করাও যায় না। কেউই বলতে পারে না মৃত্যু কেমন।"

মাথার কাছের দূত বললে—"দেখ, সূর্যের আলোই সকলের জীবনরক্ষা করে।"

পায়ের কাছের দূত বললে—"কিন্তু সেই আলো আবার জীবকে দগ্ধও করে।"

মহাপুরুষ ভাবলেন, এরা তাঁকে পরীক্ষা করছে। তিনি মনে মনে জবাব দিলেন—"ঈশ্বরের উদ্দেশ্য কেউই জানে না। কিন্তু তিনি মঙ্গলময়, মঙ্গল ছাড়া অমঙ্গল তিনি কখনই করেন না। এই কথাই ঠিক, ওদের কথা ভুল। মৃত্যু হচ্ছে তাঁর তুলাদণ্ড। মৃত্যুর তুলাদণ্ডে একদিন আমার সব কাজই ওজন করা হবে—এই কথা মনে রেখে সকলে যেন প্রতিটি মুহূর্ত কাজে লাগায়, কারণ কেবল নিজের কৃতকর্মের জোরেই মানুষ নির্ভয়ে গিয়ে সেই তুলাদণ্ডের সুমুখে দাঁড়াতে পারে। এ ছাড়া অন্য উপায় নেই। কোনোরকম তুলাদণ্ড যদি না থাকতো, তাহ'লে বিক্রেতাই বা কেমন ক'রে বুঝতো কতখানি জিনিস দিতে হবে, আর ক্রেতাই বা কেমন ক'রে বুঝতো যে সে উচিত মূল্যের জিনিস পেলে? সেই জন্যেই হোলো তুলাদণ্ডের সৃষ্টি। আর এক কথা, সূর্য কখন অস্ত যাবে তাই নিয়ে দুপুর বেলা ভেবে

কোনো লাভ নেই। কখন অন্ধকার হবে সে কথা আগের থেকেই যদি কেউ ভাবতে থাকে তাহ'লে তার সমস্ত দিনটাই বৃথায় যাবে, ভাবতে ভাবতে সে উন্মাদ হ'য়ে যাবে।"

মাথার কাছের দূত বললে—"দেখ, মৃত্যুর নিদ্রা বড় মধুর।"

পায়ের কাছের দূত বললে—"কিন্তু ঐ দেখ, হিব্রুদের পাড়ায় এইমাত্র একটি ছেলে মারা গেল। জীবিতকালে সে সর্বদাই আনন্দে থাকতো, সকলেই তাকে অত্যন্ত ভালবাসতো। এখন দেখ রাত্রি হয়েছে, পৃথিবী এখন নিস্তব্ধ, কেবল উত্তপ্ত বাতাসের একটা মর্মর শব্দ হচ্ছে, আকাশে তারাগুলো জ্বল্‌জ্বল্ করছে ; এই সময় যত শেয়াল আর নেক্‌ড়েদের আনন্দের পালা, তারা ঐ ছেলেটির কবর খুঁড়ে মৃতদেহ বের করবার চেষ্টা করছে, মাংসের আঘ্রাণ পেয়ে আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে তারা চীৎকার করছে। এদিকে দেখ, ছেলেটির বাপমায়ের হৃদয়ের ব্যথা ঐ কবরের চেয়েও অনেক গভীর।"

মহাপুরুষকে ওরা প্রকৃতই পরীক্ষা করতে চেয়েছিল, এই শেষোক্ত সংবাদটি ব'লে ওঁর মনে একটা দারুণ আঘাত দিলে। কিন্তু তখন তিনি মনে মনে বলতে লাগলেন—

"অতীত জীবনের প্রত্যেকটি কথা আমার মনে পড়ছে। আমার বাল্যকালের স্বপ্ন, আমার যৌবনের আনন্দ, শেষ জীবনে আমার কৃতকর্মের সার্থকতা, সমস্তই স্মরণ ক'রে আমার কষ্ট হচ্ছে। তোমরা কবরের কথা বলছো, শুনে ভয়ে আমার হাত-পা

ছিন্ন হ'য়ে যাচ্ছে। আমাকে তোমরা কোনো সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা কোরো না, তাতে সাহস আরো কমে যায়। এই দেহের পরিণতির কথা বোলো না, তাতে দেহের প্রতি মোহ আসে। কথাটা অন্য দিক দিয়েও ভাবা যেতে পারে, তাই বরং বলো! পথের যে গাছতলায় পথিক একটা রাত্রিও বিশ্রাম করে, সেটা ছেড়ে যেতে তার মায়া হয়, তবু সে দাঁড়ায় না, কর্তব্যবোধে সেখান থেকে এগিয়ে চলে। কবরের ভয় পেলে আমরা হ'য়ে যাই আদিযুগের বর্বরদের মতো, যারা ঈশ্বর চেনেনি, আত্মার অমরত্ব যারা বোঝেনি, কেবল চিনেছিল নিজের স্থূল অস্তিত্বটুকু। ঈশ্বরের বিরাট সৃষ্টিরহস্য যে একটুও বুঝেছে, মৃত্যুকে তার ভয় করা উচিত নয়। মনকে এই বলে বোঝাতে হবে যে মৃত্যুকে যতটা ভয়ঙ্কর মনে করছি,—বাস্তবিক তা হ'তে পারে না। তা যদি হোতো তাহ'লে এই বিশ্বসৃষ্টি এতদিন টিকে থাকতো না, আর মানুষও নির্ভয়ে এমনভাবে বেঁচে থাকতে পারতো না।"

মাথার কাছের দূত বললে—"এই লোকটি দেখছি পরম সাধু।"

পায়ের কাছের দূত বললে—"কিন্তু এ অবাধ্য হ'য়ে ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেতে চেয়েছিল। সেইজন্য একে শাস্তি নিতে হবে, মোয়াব পাহাড়ে এর কবরের কোনো চিহ্নমাত্র থাকবে না। এর জীবনের সমস্ত কীর্তিও লুপ্ত হ'য়ে যাবে।"

মহাপুরুষ বুঝলেন এরা তাঁকে পরীক্ষা করছে। তিনি এবার

নির্ভয়ে অবিচলিতকণ্ঠে জবাব দিলেন—"কবরের চিহ্ন নাই থাকুক, কিন্তু আমি জানি, যার কাজের যেমন দাম তার কীর্তিও নিশ্চিত তেমনি স্থায়ী হয়। যে কাজের কোনো দাম নেই তাই কেবল লোপ পায়। কীর্তিমান পুরুষ কখনো উচিত মূল্যের বেশি কিছু চায় না।"

কৃষ্ণবর্ণ দূতেরা এই কথা শুনে মুগ্ধ হ'য়ে উঠে দাঁড়ালো। অভিবাদন ক'রে তারা বললে—"ঈশ্বরই আপনাকে অভয় দেবেন। আমরা আপনার কাছে মাথা নত ক'রে বিদায় নিচ্ছি।"

কালো অন্ধকারের মূর্তিতে ওরা তাঁবুর ভিতর প্রবেশ করেছিল, ওদের কোনো অবয়ব দৃশ্যমান ছিল না, শুধু চোখগুলি তারার মতো জ্বলছিল। অন্ধকারের মধ্যে যখন ওরা মিলিয়ে গেল তখন মহাপুরুষ রইলেন তাঁর ভূমিশয্যায় সেই তাঁবুর মধ্যে একা।

পাহাড়ের আড়াল থেকে সূর্য উঠলো, তাঁবু ক্রমে ক্রমে উত্তপ্ত হ'য়ে উঠলো, তখন তিনি তাঁবু ছেড়ে শীতল ছায়ার অন্বেষণে মোয়াব পাহাড়ের তলায় গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে কোথাও ছায়া না দেখে ঘুরতে ঘুরতে পাহাড়ের অভ্যন্তরে চলে গেলেন, যেতে যেতে দেখলেন এক অতি গহন স্থানে পাহাড়ের মধ্যে একটি লুকানো গুহা রয়েছে। আরো কাছে গিয়ে দেখলেন জুজন বন্দী গাঁইতি দিয়ে পাথর কেটে ঐ গুহার মুখ পরিষ্কার করছে। এই স্থানের পাথরগুলো দেখতে যেন তুষারের মতো সাদা, রোদে সেগুলো বিষম তেতে উঠেছে। বন্দীদের গায়ের

রং তামাটে, চুল তাদের ঘোর কালো, কটিবস্ত্র ঘামে ভিজে গেছে। গুহার ভিতরে রয়েছে স্নিগ্ধ শীতল ছায়া, সেখানে একটি পাথরের উপর রাখা আছে দুটি সুপক্ক আপেল ফল।

মহাপুরুষকে দেখে বন্দীরা গাঁইতি রেখে তাঁকে অভিবাদন ক'রে বললে—"আসুন প্রভু, ঈশ্বরের নামে আমরা আপনাকে অভ্যর্থনা করি। আমাদের কাজ এইবার শেষ হোলো।"

মহাপুরুষ জিজ্ঞাসা করলেন—"তোমরা কে? এখানে কি করছিলে?

তারা বললে—"আমরা মহারাজার রত্নভাণ্ডার তৈরি করছিলাম। এর ভিতরে ঢুকে এখন আপনি বিশ্রাম করুন। ঐ ফল দুটি খেয়ে তৃষ্ণা দূর করুন, আস্বাদ ক'রে বলুন এর মধ্যে কোনটি বেশি মিষ্টি।"

গুহার মধ্যে ঢুকে মহাপুরুষ বসলেন একটি পাথরের উপর, শীতল ছায়া পেয়ে খুব তৃপ্তি অনুভব করলেন। তখন ফল দুটি তিনি একে একে খেতে লাগলেন।

প্রথম ফলটি খেয়ে বললেন—"আহা, এর মধ্যে রয়েছে জীবনরস। সুমিষ্ট ঝর্ণার জলের মতো প্রচুর এর রস, খেয়ে আমার তৃষ্ণা দূর হোলো। এর মধ্যে পেলুম সদ্যক্ষরিত মধুর আস্বাদ, উন্মুক্ত প্রান্তরের ফোটাফুলের সুগন্ধ। এর আস্বাদে আমি সঞ্জীবিত হলুম, নবীন শক্তিলাভ করলুম।"

দ্বিতীয় ফলটি খেয়ে বললেন—"আহা, এর পরিচয় জানি না,

তুলনা জানি না। এ বুঝি স্বর্গীয় সুধা, এতে রয়েছে মৃগনাভির সৌরভ। মন্দাকিনীর মতো এর রসধারা আমার অনন্তকালের তৃষ্ণা মিটিয়ে দিল, আমাকে অনন্তের কাছে পৌঁছে দিল। কিছুমাত্র কটু আস্বাদ নেই, মধ্যে পেলুম পারিজাতের মধুর গন্ধ, স্বর্গের মলয়-সৌরভ। এবার আমার তন্দ্রা আসছে, এইখানে শুয়ে পড়ছি। অপূর্ব তৃপ্তি, যতক্ষণে আমার তন্দ্রা না ভাঙে ততক্ষণ কেউ আমাকে জাগিয়ো না।"

ঈশ্বরের প্রেরিত দূত ঐ বন্দীরা তখন তাদের শেষ বাণী উচ্চারণ করলো।

প্রথম বন্দী বললে—"যাবত সূর্য না ডুবে যায়, আকাশ থেকে নক্ষত্র না খসে পড়ে, যাবত পাহাড় না ভূমিসাৎ হয়, উষ্ট্রিনীকুল লুপ্ত না হয়, সমুদ্র অগ্নিগর্ভ না হয়—"

দ্বিতীয় বন্দী সমাপ্তিমন্ত্র উচ্চারণ ক'রে বললে—"শান্তি শান্তি, জগদীশ্বরের জয় হোক। সকল জীবই এমনিভাবে তাঁর কাছে চলে যাবে।..."

মহাপুরুষ এদের কথা শুনছিলেন অতি অস্পষ্টভাবে, তার অর্থ বুঝতে পারলেন না! ঐখানে শুয়ে তিনি আপন অজ্ঞাত-সারে অন্তিমনিদ্রায় আচ্ছন্ন হলেন। বন্দীরা গুহার মুখ বন্ধ ক'রে দিয়ে চলে গেল। মহাপুরুষ জীবনকাল পূর্ণ ক'রে মৃত আত্মীয়-স্বজনদের আত্মার সঙ্গে মিলিত হলেন, মৃত্যুর যন্ত্রণা আর অনুভব করলেন না।

মোয়ার পাহাড়ের কোনস্থানে তাঁর কবর লুকানো আছে আজ পর্যন্ত কেউ তা জানে না। কিন্তু তাঁর অমর উপদেশবাণী লিপিবদ্ধ রয়েছে কত শাস্ত্রগ্রন্থে, আজও মুদ্রিত হ'য়ে আছে কত মানুষের হৃদয়ে।...

শেখ সাদি ছিলেন একজন অমর কবি, তাঁর নামও জয়যুক্ত হোক। কাব্যে রচেছিলেন তিনি অক্ষয় মুক্তার মালা। সেই মুক্তার সঙ্গে আমাদের এই কাহিনীর মুক্তাগুলি পাশাপাশি গেঁথে অপূর্ব একটি মাল্য রচনা করা যায়। সাদিও বলেছিলেন এক ব্যক্তির কথা, যে ঈশ্বরের অনুগ্রহে অনির্বচনীয়ের আস্বাদ পেয়েছিল। এই ব্যক্তি নির্জনে বহুকাল সাধনায় কাটিয়ে যখন সংসারে ফিরে গেল তখন সকলে তাকে বিদ্রূপ ক'রে জিজ্ঞাসা করলে—"কৈ হে, তোমার ভাবোদ্যান থেকে কোন ফুল তুলে আনলে একবার আমাদের দেখাও!" ঐ ব্যক্তি তার উত্তরে বলেছিল—"ভাই সব, মনে করেছিলাম বটে যে তোমাদের জন্যে আঁচল ভরে সেই ফুল তুলে নিয়ে আসবো। কিন্তু গোলাপের ডাল ধরে যেমনি টানলাম অমনি তার মধুর গন্ধে নিজেই এমনি মাতোয়ারা হ'য়ে গেলাম যে ডালটা মুঠো থেকে ফস্‌কে গেল।"

যিনি রসজ্ঞ হবেন তিনি বুঝে নেবেন দুটি গল্পের মধ্যে কোথায় সামঞ্জস্য আছে।...

এই অপরূপ বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে যারা আজ প্রাণধারণ করছে তাদের সকলেরই শান্তি হোক, কল্যাণ হোক।

সমাপ্ত